॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

সূর্যের পথে ফিরে এসে বীজের মধ্যে মিশে যাবো

আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে বীজের মধ্যে মিশে যাবো

"Perhaps every significant artist has only one theme, on which he performs endless Variations"

-GABRIEL JOSIPOVICI.

আমরা বাঙালীরা অনেকেই ভুলতে পারি নি দেশভাগের অমানুষিকতার কথা, সেই ১৯৪৬ সালের 'গ্রেট কিলিং' এর দুঃস্বপ্নের কথা। চার হাজার মৃত দশ হাজার আহত এবং একলাখ মানুষের ঘর-বাড়ির ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল রাজনীতির কুটিল শক্তি। আমাদের বাঙালীর চিরকালীন মিলন ঐতিহ্যে দ্বিজাতিতত্ত্ব এক বিরাট সংকট চাপিয়ে দিয়েছে। তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে কুটিল রাজনৈতিক স্বার্থ - সংঘর্ষ, লোভ আর লালসার বিস্তার। ধর্মীয় বিদ্বেষকে ভিত্তি করে যে বিভেদ দেখা দিয়েছিল তাকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পেছন থেকে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে গেল এক ধ্বংসের দিকে। বাঙালীর ঐতিহ্যই শুধু নয়, দেশবোধ আর মাটির টানও কেমন যেন আলগা হয়ে যেতে বাধ্য হলো। এতদিনের ধরে রাখা মানুষের অভ্যাস আর জীবন শেকড় হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে পড়লো। বিষাক্ত রাজনীতির আবহাওয়া মানুষের জীবনকে মাকড়সার জালের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অসহায় করে তুললো। দেশভাগের জিঘাংসা ও হিংস্রতায় ভরা দিনরাতগুলো মানুষের মনে এনে দিলো এই চতুরালির প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান। ''উনিশ শতকের মানুষের কাছে দুনিয়া যা ছিল, য যা মনে হত, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষের কাছে দুনিয়া মোটেই তা নয়। জীবনবোধটাই পালটে গিয়েছে। বিশ্বাসের ভাঙনে মানুষ আজ নোঙর ছেঁড়া নৌকার মতো, মানুষ

আজ সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ।''[১]

লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদার ইতিহাসের এই পালাবদলের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী । পাবনা জেলার গ্রামের সুখ শান্তির নীড় থেকে ছেলেবেলাতেই তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল আধুনিক সংস্কৃতির পরিচয় নেবার জন্য তবুও এই মাটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে । পরবর্তী সময়ে গ্রাম থেকে তাঁদের পুরো পরিবারটি বাস্তুহারা হয়ে চলে এসেছিলো কোচবিহার শহরে । এই গ্লানি তাঁর সমস্ত সাহিত্য জীবনেই যেন বারে বারে উঁকি দিয়ে যায় । অনেক লেখাতেই ঘুরে ফিরে আসে উদ্বাস্তু মানুষের মুখ, তাদের জয় পরাজয়ের চেতনার ছাপ । নিরন্ন নিরাশ্রয়, অবহেলিত মানুষের দল যাদের জীবনে রয়েছে শুধুই ক্লেদ, লেখকের সযত্ন সৃষ্টি যেন তাদের বাঁচার দলিল । ঘরহারা মানুষ বারেবারেই ফিরে পেতে চেয়েছে তাদের নিজস্ব বাসভূমি যেখানে এক নিশ্চিন্ত পরিমণ্ডলে তারা আবার ফিরে পাবে তাদের স্বাধীন গেরস্থালী ঃ নিজস্ব চিত্তবৃত্তি । মাটির এই দুর্নিবার আকর্ষণে তারা বরণ করে নিয়েছে হাজারো দুঃখকষ্ট, পথ চলার নিদারুণ যন্ত্রণা । মরুভূমির ধূসর বালুকাবেলায়, গহন অরণ্যের গহীনতায়, শহরের ইটকাঠের মধ্যে যে পথচলা তা কখনো সফলতা পেয়েছে আবার কখনো বা পায়নি, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের ভেতরে চাপা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে । তবু পথচলা থামেনি । শুধুমাত্র বাসভূমির ক্ষেত্রে নয় এর দোলা লেগেছে মানুষের মননধর্মেও । নিজস্ব বিশ্বাসের সুস্থিতভূমিটি বিচ্যুত হলে সেওতো একধরণের উদ্বাস্তু জীবন । সেখানে ফেরার জন্য মানুষের তখন সাধনা শুরু হয় । এই সাধনারই অন্য নাম হলো আধুনিকতা, ''নিঃসঙ্গ মানুষের উৎকণ্ঠা, উৎক্ষেপ ও বেদনা, নিঃসঙ্গ মানুষের চক্রাকার আত্ম-পরিক্রমা, বিচ্ছিন্নের - যথার্থ বিচ্ছিন্নের গোলকধাঁধায় ফেরা, এ সব বিংশ শতকীয় আধুনিকতার প্রধান এবং বিশিষ্ট একটি স্রোত ।''[২] এবারে আমরা আলোচনা করে

দেখাবো যে তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই বোধের সার্থক পরিপ্রকাশ কিভাবে ঘটেছে ।

অমিয়ভূষণের 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই' নাটকটি স্নেহলতা সেন সম্পাদিত 'মন্দিরা' পত্রিকার ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়(আষাঢ় ১৩৫১) প্রকাশিত হয় । যে পরিবেশে - যে অবস্থার সাহচর্যে মানুষের জীবন যাপন তার বিচ্যুতিতে সে গ্রহপরিমণ্ডলের ভারসাম্যহীন তারকাবিচ্যুতির অবস্থা প্রাপ্ত হয় । এতদিনের পরিচিত বাস্তুহীন মানুষ তার নিজস্ব চিত্তবৃত্তির ম বিপরীত মেরুবিন্দুতে এসে দাঁড়ায় । পরিবেশের ভারসাম্য ক্ষুন্ন হলে তার দোলা এসে লাগে মননধর্মে । বাহ্যিক বস্তুহীনতার নিরাশা মনের কোণে বাস্তুহীনতার জন্ম দেয় । তাই উদ্বাস্তু মানুষ কেবল নিজের জাত বাটি ঘর গেরস্থালী হারায় না, হারায় মানসিক দৃঢ়তা - চিত্তবৃত্তির সমস্ত সদ্‌গুণ । এরই সার্থক প্রতিফলন এই নাটকে । মিশরের ফ্যারাও'র রাজত্বে নীলনদের উর্বর শ্যামল ছোঁয়ার পরশে যাদের জীবন স্নাত ছিল সেই ইজরায়েলীরা নিজেদের পথচলা শুরু করেছিল বহু প্রতিকূলতার মধ্যে - মরুভূমির নির্জলা শুষ্কতার বুকে । একটুকরো স্বাধীনতা - স্বক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে বিচরণ তাদের কাম্য ছিল । প্রবীন মোজেস তার অভিজ্ঞতার চুলচেরা বিশ্লেষণে পথ দেখাচ্ছিলেন । কিন্তু আবাল্য পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে মরুধূলোয় আমরা দেখলাম এক উদ্বাস্তু অসহায়তা - অসংলগ্নতা তাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে । তাইতো যে বীর নাদাবের পদচিহ্ন ইজরায়েলীরা মনে মনে কামনা করতো আদর্শ হিসেবে এতদিন, তার পদচিহ্নের দিকে মুখ লুকিয়ে ইজরায়েলী মায়ের চোখে জল আসে । ইথিওপিজয়ী নাদাবের মত বীরকেও বলতে হয় আ-রণকে ''তোমরা সন্ধ্যে না হতেই অমন করে তাঁবুর আলো নিভিয়ে দাও কেন ? ...সত্যি একটু ভয় হয়, আলোটা জ্বালিয়েই ম রেখো ।''(দি গড অন দি মাউন্ট সিনাই, পৃ-৮২)

মিশরের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী কালিয়াটিসের শোষণে যাদের জীবনে অত্যাচারমুক্ত নতুন আলো দেখিয়েছিলেন যে ম মোজেস, সেই মোজেসের মনেও ভাঙন এসেছিলো। বাস্তুহীন মনে বাসা বাঁধে নিরাশা। তাই সমর্থ বহু বীর ইজরায়েলীকে নিয়ে ভুল পথে পা বাড়ায় বহু চিত্তের আকর্ষণকারী রূপবতী জুডিথ। মোজেস তাদের কাছে আর দলনেতা নন। যে মোজেস অতীতে বহুবার ইজরায়েলীদের বাঁচিয়েছেন - নতুন আশার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছেন, যে আ-রণ তার মাথা আঁকশির মত বাঁকানো হাতের লম্বা লাঠি দিয়ে(আ-রণ'স রড) নীল নদকে শাসন করে তাদের ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে, ইথিওপিয়া বিজয়ী যে নাদাব ইজরায়েলী জীবনে বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সেই মোজেস, আ-রণ, নাদাবকে সামনা সামনি ঘেরাও করে ইজরায়েলী উদ্বাস্তু জনতা। কৈফিয়ত চায় এই অর্থহীন পথচলার, নিরাশার এই অন্ধকারের মধ্যে এনে ফেলার কোন অধিকার তাঁদের ছিলো? তাইতো শুনি কেইনের কণ্ঠে "...তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে আমরা ফ্যারাও'র রাজ্য ছেড়ে এসেছি, তোমাদের কথায়, প্ররোচনায় আমরা নীলনদের সাথে শত্রুতা করেছি। আর আজ আমাদের পায়ের নীচে সর্বনাশ, সবশুদ্ধ তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সর্বনাশে যেতে হলে তোমাদেরই আগে যেতে হবে, কি বলো, সেইতো নিয়ম? দিনের পর দিন আমরা কষ্ট সহ্য করেছি। জল নেই, আহার নেই, তবু আমরা তোমাদের পর বিশ্বাস রেখে চলেছি। আর আজ? মোজেস বলেছে বৃষ্টি হবে, আর আজ এই ধুলোর ঝড়ে আমরা মরতে বসেছি। বারবার সে শুধু মিছে কথা বলে আমাদের ঠকিয়েছে, যা জানে না যা তার সাধ্যের বাইরে ম তার মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে এসেছে। আমরা সবাই মরব।"
(তদেব, পৃ. ১০৭)

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে বহু বিপরীত আচরণের দোলাচলে তার জীবন সর্বক্ষণই মথিত হয়। তাইতো আ-রণ এর হাতে ওঠে বাঁশী। ঘটনাস্থল তা হোক না কেন মরুভূমির ধূ ধূ বালুকা-রাশির বুকে বেড়ে ওঠা একটি ন্যাড়া খেজুর গাছ। পরস্পরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ দুটি যুবক যুবতী নাদাব আর রুথের দেখা হলে রুথের গালে জমে রক্তিমাভা। নাদাবের বিপদ আশংকায় প্রনয়ী রুথের মন যেমন ব্যাকুল হয় তেমনি ব্যাকুলতা আমরা দেখি পিতা যোজেফের বিপদ আশংকায়। পিতৃস্নেহ আকাংখী, দয়িতের ভালোবাসা প্রত্যাশী প্রতিটি মেয়ের মধ্যে কাজ করে এক সর্বোত্তম নারীত্বমাখা মন যে নারীত্ব আমাদের সৃষ্টি করে - পালন করে - তার অঞ্চল ছায়ায় ঘিরে রাখে। হাজারো বিপদেও সে নারীত্ব টলে না কারণ তা সর্বজনীন। তাইতো তীব্র অনাহারে জুডিথের মেয়ে যখন অন্নহীন ইজরায়েলীদের সঞ্চিত রুটি চুরি করে খেতে শুরু করেছিলো তখন রুথের ক্ষোভের কণ্ঠে লেখক আমাদের জানান ''ছি - ছি - ছি মেয়ে মানুষ হয়ে খাবার চুরি করে খাবার চুরি করে XXXXXXX খায় না।''(তদেব, পৃ-৮০) তখন আমরা সচেতনভাবে উপলব্ধি করি সেই নারীত্বের যে নারীত্বে আমাদের বেঁচে থাকার নেপথ্যশক্তি। যার বিহনে কহু পুরুষই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বেন। নারী যদি তার মূল্যবোধ থেকে স্খলিত হয়, তাহলে পুরুষ যেন বাস্তুহারা হয়, অস্তিত্বের ভিত্তি তার টলে যায়।

বাস্তুহীন মানুষের এই পথচলা যুগে যুগে নদীর স্রোতের মতো। মানুষ যদি তীব্র আত্মবিশ্বাস নিয়ে পথ চলে তবে প্রকৃতিও একদিন তার অঢেল দানে মানুষকে ভরিয়ে তোলেন। বাস্তু উৎখাত মানুষ সেদিন ফিরে পায় তার সার্থকতা। হোক না অন্যরকম - অন্য স্বাদমাখা, তবু জীবনের অন্য নামও যে জীবন। মরু ধূসরতার অবসানে

পশুপালক ইজরায়েলীদের মধ্যেও সিনাই পাহাড়ের পাদদেশে নেমে এসেছিলো সে জীবন - হয়ত বা অন্য নামে, অন্যভাবে, তবুও তো তারই নাম জীবন। বৃষ্টির প্রানস্পর্শে সিক্ত ইজরায়েলীরা দেখেছিলো তাদের উদ্ধারকর্তা মোজেস সিনাই পাহাড়ের চূড়ায় নতজানু হয়ে দুহাত তুলে অভিনন্দন, অভিবাদন জানাচ্ছেন সেই তৃতীয় শক্তিকে যার অদৃশ্য ইচ্ছায় মানুষেরা চিরকাল চালিত হয়ে আসছে ''চারিদিকে আবার বজ্রপাতের শব্দ। আবার সিনাই পাহাড়ের চূড়া বিদ্যুতে ভরে তীব্র আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আলোকে দেখা গেল একটি মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ঐ মূর্তিটি ধীরে ধীরে জানু পেতে বসে উর্দ্ধে দুবাহু উৎক্ষিপ্ত করে ছিল যেন কাকে হৃদয় ভরে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে তার ভাব ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।''(তদেব, পৃ-১১০)

(গড়শ্রীখণ্ড উপন্যাসটি কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ১৩৬০ সালের জৈষ্ঠ্যমাস থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫৭ সালে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক উপন্যাসটিকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তর, ৪৬ এর দাঙ্গা ও দেশবিভাগের আঘাতের মাঝে পদ্মানদীর ধারের পাবনা জেলার চিকন্দি, বুধেডাঙ্গা, চরণকাশি, মানিকদিয়ার গ্রাম আর বন্দর দিঘাকে কেন্দ্র করে নানাধরণের মানব জীবনের অভিঘাত বর্ণনা করা হয়েছে এখানে। সময়ের সমগ্রতাকে স্পর্শ করে যে জীবন বয়ে চলে, জয়-পরাজয়ের রথচক্রের মাঝে যার সর্বদা অবস্থিতি, তাই হবে মহৎ সাহিত্যের উপজীব্য। এই উপন্যাসে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। সময়ের ভাঙাগড়ার তীরে মানুষ সমষ্টিগতভাবে যে বাঁচার চেষ্টা করে তারই শিল্পরূপ গড়শ্রীখণ্ড। সমাজ এবং ব্যক্তির দ্বন্দ্বে যেমন সমগ্র জীবন এখানে পরিস্ফুট তেমনি এটাও পরিস্ফুট যে কালের আঘাতে সেই জীবন কেমন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর দেশভাগ মানুষের নিশ্চিন্ত

জীবনযাত্রাকে কেমন করে ওলট পালট করে দিল। ভূমি উৎখাত মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছিল যদিও এব কিছুকে অঙ্গীকার করে নদীর নতুন চর জাগার মতন তাদের নবপ্রত্যাশায় এগিয়ে চলার আশ্বাসও লেখক আমাদের শুনিয়েছেন।

সাহিত্য সমালোচক শ্রীঅরুকুমার সিকদার এই উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "এই কালখণ্ড নিয়ে লেখা উপন্যাসটি কোনো একটি মূল কাহিনীর এক রৈখিক বর্ণনায়ন নয়। চারটি কাহিনীবৃত্ত উপন্যাসের সমগ্রতায় একটি বড় বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কান্বিত হয়েছে। হয়ত বলা যাবে হর্ম্যের মতো এই উপন্যাসের গড়ন অনেক-গুলো অধ্যায় - প্রকোষ্ঠ সংবলিত চারটি মহল নিয়ে গড়ে উঠেছে তার স্থাপত্যমহিমা। প্রত্যেকটি কাহিনীবৃত্তের Strict compositional and archifectural Significance আছে। আটত্রিশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে দশটি পরিচ্ছেদে আছে মাধাই - মুরতুন - ফতেমা - ইয়াজ - ইসমাইল - ফুলটুসি - টেপির মা - গোঁসাই'এর কাহিনী। নয়টি অধ্যায়ে আছে ভূমধ্যকারী সান্যাল মশাই - অনসূয়া - সুমিতি - রূপনারায়ণ - মনসা - সদানন্দ মাস্টারের কাহিনী। নয়টি অধ্যায়ে পাচ্ছি রামচন্দ্র - কৃষ্টদাস - ছিদাম - মুঙলা - পদ্ম - সনকা - ভানুমতীর কাহিনী। এই তিনটি কাহিনী বৃত্তের গুরুত্ব সমান বিস্তারও সমান। চারটি অধ্যায় নিয়ে বর্ণিত হয়েছে তুলনায় ছোট আলেফ - এরফান - আল মাহমুদ - সাদেকের কাহিনী। বাকি ছয়টি পরিচ্ছেদের কাজ এই চারটি কাহিনীবৃত্তকে যুক্ত করা এবং সমগ্র উপন্যাসের বৃহত্তর বৃত্তের অঙ্গীভূত করে দেয়া। সমস্ত নির্মাণের চূড়ায় পৌঁছে যাই আমরা, উপন্যাসের ঠিক মাঝখানে আঠার সংখ্যক পরিচ্ছেদে সান্যালের বাগানে সমবায় ভিত্তিক মহোৎসবের বর্ণনায়। তাকে মহোৎ-সব না বলে মোচ্ছব বলাই ভাল। সে এক উদ্দাম জীবনভোগ। এই

সামগ্রিক প্রীক্ষেত্রে কীর্তন শুনে মনে হচ্ছে 'যেন কোনো এক নতুন জগৎ থেকে নিঃশ্বাস নেওয়ার নতুন বাতাস এসেছে, প্রাণপণে সে দুর্ভাগ্যকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে প্রত্যেকে।' ভোজের এলাকায় আনন্দের উচ্ছ্বাস যেন সমুদ্রতরঙ্গের মতো ভেঙে পড়ে, 'প্রত্যেকটি ভোজ্যদ্রব্য যেন এক একটি রাজ্যলাভ।' কিন্তু এই মহামিলনের শিখরের ভিত্তিতে ঘুণ ধরেছিলো। এই জীবনভোগ সেও যেন মরিয়ার মতো, দেয়ালে পিঠ দিয়ে। রামচন্দ্র আর এরশাদ একত্র দাঁড়ালে কয়শো হয়। সব বিপত্তিকে তারা প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু রামচন্দ্র আর এরশাদ একত্র দাঁড়াতে পারলো না। আঠার সংখ্যক অধ্যায়ের পর থেকে এক বিপর্যয় ভাঙনের ধাপে - ধাপে নেমে এল।''[৩] উপন্যাসটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এর ভেতর তিন ধরণের মানুষের কথা জানতে পারা যায়। সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ন্তীখণ্ড উপন্যাসটি আলোচনা প্রসঙ্গে এই রকম অভিমত পোষণ করেছেন। সুরো, ফতেমা, রজব আলি, সান্দার জয়পাল, টেপি, টেপির মা, মাধাই এরা প্রথম শ্রেণীর। যাযাবর সান্দার গোষ্ঠীর মানুষ এরা অনেকেই। স্বভাব অপরাধী সান্দারগোষ্ঠী। যদিও এই অপরাধপ্রবণতা অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যেরই কুফল এ সম্বন্ধে গবেষণার অবকাশ আছে। গোষ্ঠীগত ধর্মগত পার্থক্য থাকলেও সমাজের সাধারণ দিনমজুর চাষীদের অবস্থা অনেকটা এদেরই মতো। দুর্ভিক্ষ এদের গায়ের মেদমজ্জা কেড়ে নিয়েছে, সুরতুন - ফতেমা - ফুলটুসিরা ট্রেনে ট্রেনে চাল চালানের অবৈধ ব্যবসা করে, মাধাই বিষ দিয়ে গরু মেরে তার চামড়া [illegible] বিক্রী করে, টেপি নিজেকে বিক্রী করে অতিরিক্ত সুখ কিনতে চায়, টেপির মা পেটের দায়ে এক বৃদ্ধ বৈরাগীর জীবনযাত্রার সঙ্গিনী হয়ে পড়ে, উক্ত কামারের পরিবার - হালদারপাড়ার কয়ঘর মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর যে চরিত্রগুলো আমাদের

সামনে এসে দাঁড়ায় তারা হলো রামচন্দ্র, কৃষ্টদাস, মুণ্ডলা, ভানুমতী, ছিদাম, পদ্ম, আলেফ, এরফান। পরিশ্রমী মানুষ এরা। যুগে যুগে ওরা কাজ করে। এদের মধ্যে রামচন্দ্র চরিত্রটি অনবদ্য সৃষ্টি ''রামচন্দ্র 'মাটির এই বলবত্তম সন্তান', সে চূড়ান্ত চাষীর আদলে সৃষ্ট। চাষবাস রামচন্দ্রের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের হেতু নয়, জীবনের উদ্দেশ্যও বটে। সে পারলে পৃথিবীকে চষে ফেলে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, জমি অমন অনেক দেখি, চাষা দেখি না। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী এই কৃষক ভয় পায় না, কাউকে ভয় পেতে শেখায় না। অনেক খরায় পিঠ পুড়েছে, অনেক বর্ষায় শ্যাওলা পড়েছে, এমন একজন চাষী সে, যার কথা মন্ত্রপূত হয়ে শুনতে হয়। তার প্রতিটি কথাকে বারবার প্রমাণিত সত্য বলে বোধ হয়। খরা - মন্বন্তর - বন্যা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অপরাজেয় চিরন্তন কৃষকের চরিত্র এঁকেছেন অমিয়ভূষণ রামচন্দ্রের মধ্যে।''[৪] চাষবাসের সচ্ছলতা এদের জীবন থেকে সরে গেল পরপর তিনটি আঘাতে ''উঠে বসে পায়ের ধুলো ঝেড়ে চোখের জলে ভিজে গোঁফজোড়া কাপড়ে মুছে কিছুটা শান্ত হলো রামচন্দ্র। এ কি হলো পৃথিবীর। মানুষের এত কষ্ট কেন? কোনো কোনো রোগের রক্তমোক্ষণ করা নিয়ম ছিল সেকালে। এ যেন তেমনি কোনো চিকিৎসা। কিন্তু রামচন্দ্র পশুর চিকিৎসা জানলেও নিজে কখনো কোনো পশুর রক্তমোক্ষণ করেনি। এ যেন কোনো অত্যন্ত খুঁতখুঁতে কৃষকের রোয়ার বেছন বাছাই করা। যন্ত্রটি মাটি থেকে শিকড়শুদ্ধ চারাগাছগুলিকে টেনে টেনে তুলছে। কিন্তু সে কৃষক যেন সাধারণ কৃষকের চাইতে কম জানে কিংবা বেশি জানে। চারাগুলিকে বারে বারে তুলছে আর লাগাচ্ছে, আর লাগানোর আগে চারাগুলির কোমলতম শিকড়ে যে মাটিটুকু লেগে থাকে আছড়ে আছড়ে সেটুকুও ঝেড়ে ফেলেছে। অহহ। একবার না, তিনবার। সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা, তারপর এই

দেশভাগ।''(গড়শ্রীখণ্ড, পৃ. ৫২৭) রাজনীতি, ধর্ম আর সমাজের বন্ধন মানুষকে তার আশ্রয় থেকে তুলে অনেক ক্ষেত্রেই অসহায় করে দেয়। পরপর তিনটি আঘাতে মানুষগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। সান্যাল মশায়, অনসূয়া, রূপনারায়ণ, মনসা, সুমিতি এঁরা তৃতীয় দলভুক্ত, অভিজাত পরিবারের লোক। জমিদারি বৃত্তির অবক্ষয়ের শেষ বৃন্তে এদের অবস্থান। কালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সান্যাল মশায়কে তাই ভাবতে হয় এই গ্রামে তিনি অবাঞ্ছিত, এখানকার জীবনের সাথে তার কোন যোগ নেই, কি হবে তার নতুন ঘরবাড়ি তৈরী করে' ''গঙ্গাগামিনী পদ্মা তাদের প্রতি বিমুখ। কালের স্রোত এবং পদ্মা তাদেরকে পরিহার করেছে,''[৫] তাই গ্রাম ছেড়ে এদেরও চলে যেতে হয় নতুন জীবনের সন্ধানে। সান্যালমশাই চেয়েছিলেন যে হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি একাই কালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। কৃষকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মিশ্রিত সম্ভ্রম নিয়ে প্রাচীন ভুঁইয়াদের মতো বীরত্বে শেষবারের মতো রুখে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না। তাকে গড়শ্রীখণ্ড ছেড়ে নতমস্তকে নতুন আশ্রয়ের দিকে চলে যেতে হলো ''রামচন্দ্র কাছারীতে প্রবেশ করলো দুঃসময়ে। কাছারির অর্ধেক দরজা বন্ধ। সান্যাল মশাইদের খাস কামরার দরজায় মস্তবড়ো একটা তালা ঝুলছে। কাছারিতে দাঁড়িয়ে অন্দর মহলের দোতলার যে জানালাগুলি চোখে পড়ে সেগুলিও বন্ধ। দুপুরের মতো তাজা রোদে এটা ঘুমের দৃশ্য হতে পারে না। এতক্ষণে অন্তত একজন বরকন্দাজেরও দেখা পাওয়া উচিত ছিলো। বরকন্দাজ এলো না। আমলারা কোথায়? প্রজারা? সব শ্মশান। দিগরের গোরস্থান। নায়েব নিজেই বেরিয়ে এলো কাছারীর একটি ঘর থেকে। নায়েবের হাতে হুঁকো, সে যেন বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে। রামচন্দ্রর মনে হলো মুঙলা নায়েবের সঙ্গে যে কলহ করেছে সেটা

মিটিয়ে ফেলা উচিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটাকে মূল্যহীন বোধ হলো। নায়েব চললো - 'তুমিও বুঝি সেই খবরটাই চাও ? অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে।'

- কি খবর ?

- খবরটা সত্যি। কর্তা আর গিন্নী চলে গেছেন দেশভ্রমণে। রামচন্দ্র এতবড় নির্দয় সংবাদটা আশা করেনি। অভিভূতের মতো সে বললো, ছাওয়ালরা ?

- তার আগেই গেছে। দেশভাগের কথা শুনলে, রামচন্দ্র ?

রামচন্দ্রের মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেউ তার বুকে চেপে বসেছে।'' (গড়্রীখণ্ড, ৫১১, ৫১২) যে সুমিতি সান্যালবাড়িতে প্রচলিত সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে গর্ভবতী অবস্থায় প্রথম নববধূ হিসেবে প্রবেশ করেছিলো, চেয়েছিলো এতদিনের বদ্ধ খাঁচাটায় একটু নতুন আলো প্রবেশ করুক তাকেও সন্তান সাথে করে চলে যেতে হলো কলকাতায়। হয়তবা সেখানে নতুন কোনো আরম্ভের সূত্রপাতের সম্ভাবনায়।

রামচন্দ্র মাটির বলবত্তম সন্তান। সে শুধু চাষীই নয়। মাটিই তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। মাটির রসে তার জীবনের ভিয়েন। পারলে সে গোটা পৃথিবীটাই চষে ফেলতো। খরা - মন্বন্তর বন্যার মাঝে চাঁদ সদাগরের মতো সে দৃপ্ত পৌরুষে ভাস্বর। সমাজের সনাতন কাঠামোটা সে বারবার ধরে রাখতে চেয়েছে। তাই ছিদামকে পদ্মর আকর্ষণ থেকে রক্ষা করতে সে মহাভারতের ভীষ্মের উপাখ্যান শোনায়। নিজের মেয়ে জামাই মুঙলাকে পদ্মর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, মেয়ের মত ভানুমতীকে রক্ষা করার জন্য পদ্মকে নিজের করে নেবার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এত করেও কালের নিষ্ঠুর খেলার কাছে সে অসহায়। হিন্দু মুসলমানের মহামিলনের স্বপ্ন গড়্রীখণ্ডের মতো

প্রত্যন্ত বাংলাদেশেও সফল হতে পারে নি। শহরের নোংরা রাজনীতি গ্রামেও তার মাকড়সার জাল বিস্তৃত করে দিয়েছে। রামচন্দ্র আর এরশাদের মতো চাষীভাই একত্রিত হতে পারলে অনেক দুর্গ সফল হতে পারতো। কিন্তু তারা একসাথে দাঁড়াতে পারলো না। মুঙ্গলা ভানুমতীকে নিয়ে ~~শর্ষ~~ বর্ধমানে চলে যেতে চাইলো - ''রামচন্দ্র বললো, 'কোনদিকে আগাই, তা ক' মুঙ্গলা।

একটু ইতস্তত করে মুঙ্গলা বললো, পুত্তুর লিখছে -

- কি লিখছে, কবে লিখছে?

- কইছে বর্ধমান জমি নিছে। কইছে সকলকে সেখানে যাতি।

- ভানুমতীকে নিয়ে যাবা?

- গেলে তাই লাগে। হ কইছে আমার এখানকার জমির বদলা দশ বিঘা জমি পাইছে বর্ধমানে। এক মোসলমান এখানে আসবি। আপনাকেও লেখছে চিঠি।''(তদেব, ৫২৪) রামচন্দ্র সবকিছুকে অস্বীকার করে বাঁচতে চেয়েছিলো নিজের জমিটুকু সম্বল করে। কিন্তু তার মনেও শেষ পর্যন্ত সংশয় বাসা বাঁধে। এভাবেই সময়ের অশান্ত গতি বাংলার গ্রাম জীবনে ধস নামিয়েছিলো ''রামচন্দ্র ভাবলো, জনবলকে হ সে ক্ষয় থেকে রক্ষা করেছে, কিন্তু সে নিজে কি সবদিক রক্ষা করে চলতে পারবে? বৃষ্টি নামে কই? আকাশ ফাটে বৃষ্টি নামে কই? হা হা।''(তদেব, ৫৩১)

সুরতুন্না যার ডাক নাম সুরো এই উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র। যদিও আর্থ সামাজিক কারণে কাব্যে বর্ণিতা নায়িকাদের মতো রূপ ও সৌন্দর্য তার থাকা সম্ভবপর হয় নি তবুও সে একজন পরিপূর্ণা নারী। চুলের জট ও নোংরা শাড়ী পরিহিতা সুরতুন দিঘা রেল স্টেশনের খোটার মাধাই বায়েনের চোখে কামনার মদিরতা ছড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়। কিন্তু বালিকা বয়সের একটি অবাঞ্ছিত

ধর্ষণ তাকে কামশীতল করে দিয়েছিল। অশিক্ষিতা দুর্বলা এই নারী কিছুতেই এই ফ্রিজিডিটি অতিক্রম করে মাধাইকে গ্রহণ করতে পারে নি। যদিও মাধাই'এর দেওয়া নতুন শাড়ী পড়ে তার মনে যৌনবোধ কিছুটা জেগে উঠেছিলো। মনে মনে সে মাধাই'এর কাছে সমর্পিতা ছিল চিরটাকাল। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি বন্যার জলে চারপাশ ভেসে গেলে রোগে অথর্ব মাধাইকে রক্ষা করার চেষ্টায় সুরতুন আর ইয়াজ জল ঠেলে এগোতে লাগলো। তখনই সুরতুনের মনে হলো এই জীবনে বাঁচার অর্থ কি? কিন্তু ইয়াজ তাকে আশ্বাস জোগায় যে সে চাষবাস করে আহার্য সংগ্রহ করে জীবনপ্রবাহ সচল রাখবে। এখানেই লেখক পরাজিত জীবনে নব সম্ভাবনার স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। সুরতুন চরম দুর্যোগের মাঝে শরীর মনের এতকালের জমে থাকা শীতলতা কাটিয়ে উঠতে পারলো "কিন্তু এর চাইতেও চূড়ান্ত বিস্ময়ের কিছু আছে। সুরতুনের এই শরীরের ভিতর থেকে এক অচেনা শরীর যেন আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তার বোকামিগুলো যখন ইয়াজের দেখা প্রথম কামনার উত্তাপ হয়ে উঠতে লাগলো, ক্লান্ত আবেগের করুণা নিয়ে তার মন তখনো মাধাইয়ের কথা ভাবছে। কিন্তু মাধাইয়ের বেদনায় ব্যথাতুর মন নিয়েও তার সেই নতুন শরীরকে খানিকটা স্নেহ না দিয়ে পারেনি সে।" (তদেব, ৫৪১)

দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফতেমা সমস্ত হারিয়ে চালের চোরাচালানকারী হতে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু এসবকিছু তাকে এবং তার নারীসত্তাকে বিনষ্ট করতে পারে নি। ফুলটুসির ছেলে মোভান আর ওয়ানালকে মাতৃস্নেহে নিজের আঁচলে বেঁধে মানুষ করতে চেয়েছিলো। চিরন্তন সুপ্ত মাতৃসত্তাই বুঝি তাকে অবৈধ মাতৃত্বে জড়িয়ে ফেললো। "ফতেমার কথাই বিচার করো। সব চাইতে শক্ত, সব চাইতে বুদ্ধিমান। কি করলো সে? জেবু অলীক ভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো, আর ফতেমা

জেনে শুনে এ কি ঘটালো ? এমন হতে পারে নাকি জেবুন্নিসার জন্যই তাকে এ পথের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো ? একটা কথা মুরতুন শত চেষ্টাতেও বুঝতে পারবে না - 'হাওয়ান চাওয়া' কি করে ফতেমার জীবনের মর্মে যুক্ত হলো । সে সন্তান চাইতো বলেই ফুলটুসির ছেলেদের নিয়ে আতিশয্য করতো কিংবা তাদের সঙ্গে নকল মায়ের অভিনয় করেই 'হাওয়ান - চাওয়া' জেগে উঠেছিলো তার ?''(অদেব, ৫৩৪) আগামী দিনের যে সন্তান দুর্যোগের মধ্যে আসছে সে হয়তো বাঁচতে পারবে না । আবার হয়তো বা সমস্ত অন্যায় বাধাঠেলে দূরে সরিয়ে পৃথিবীকে শান্ত সৃষ্টিশীল করবে । কংসের অত্যাচারের কারাগারেইতো শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিলো ।

কালের প্রবাহের অলস গতি শুধু হিন্দুদেরই নয় একইভাবে আঘাত করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে । তাই আনেক শেখ যে কিনা অবসর জীবন কাটাতে এসেছিলো গ্রামে, এসেছিলো নিশ্চিন্ততার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে সেও জীবনের খেই হারিয়ে ফেললো । কলকাতার দাঙ্গায় ডাক্তারী পাঠরত একমাত্র ছেলে সাদেক মারা গেলে উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলো । জীবনটা যে এত শূন্য হতে পারে তা তার জানা ছিলো না । কিন্তু বন্যার ভয়াবহতা কেটে যাবার পর সেই আনেককেই আমরা দেখলাম যে বালির কত নীচে উর্বর মাটি রয়েছে তা লাঠি পুঁতে পুঁতে পরীক্ষা করছে । কারণ এই উর্বরতাই নতুন শ্যামলিমা গঠন করতে পারে । প্রাণের পরশ আবার জেগে উঠবে ঊষার প্রকৃতি তথা জীবনের বুকে ''মুরতুন দেখতে পেলো কে একজন তাদের দিকে এগিয়ে আসছে । খুব ধীরে ধীরে পা মেপে মেপে জোলার ধার দিয়ে সে হাঁxxxxx আসছে । একবুক সাদা দাড়ি, একটা অত্যন্ত লম্বা জামায় হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা । লোকটি এক একবার থেমে হাতের লাঠিটা বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে তারপর সেটাকে তুলে লাঠির ডগাটা ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে কি একটা পরীক্ষা করলো । সে প্রক্রিয়াটা সে অনেকবারই করেছে ।

ইয়াজ বললো, 'চরণকাশির বড়ো ভাই আলেক সেখ না ? হয়, ভাই । ওই যে, মুরো, যার হাওয়ান কাজিয়ায় মারা গেলো ।'
- আহা-হা পাগল হইছে ?
- না, মনে কয় । চাষ দেওয়ার কথা ভাবে । বালির কতো নীচে মাটি তাও কোথায় দ্যাখে ।''(তদেব, ৫৪১, ৫৪২)

উপন্যাসে আর একটি প্রশান্ত চরিত্র গোঁসাই । টেপি'র মা-কে নিয়ে তার সাধুকরী । জীবনে যত ঝঞ্ঝাপটাই আসুক সে আদৌ বিচলিত নয় । কারণ জীবন জীবনের মতোই । পৃথিবীতে সমস্ত জমিই যখন মালিকাধীন তখন তাকে অন্যের জমিতে ঘর বাঁধতেই হবে । সে ঘর হয়ত চিরস্থায়ী হবে না, তবু তার কোন ক্ষোভ নেই । এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বসত তুলতে তুলতেই মূল উৎখাত মানুষ ফুরিয়ে যায় ''এমনি বাঁচবার ঘর তুলতি তুলতি পরমাই ফুরাবি । নিষ্পত্তি ।'' (তদেব, ৩০০) নিরাসক্ত দর্শনের এই দৃঢ়বোধ কত ভবঘুরেকে যে চালিত করেছে তা বলা মুশকিল ।

যে মাধাই একদিন জীবিকার জন্য পরুকে বিষ দিয়ে মারতো, পরবর্তী জীবনে সে দিঘাবন্দর স্টেশনে পোর্টার হয়েছিলো । ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে থেকে রাজনীতির তত্ত্ব অনুভব করেছিলো সে । কিন্তু পরিণতিতে আমরা দেখি গোবিন্দ'র কাছ থেকে বাঁচার শিক্ষা গ্রহণ করে সে মহাদেবের মতো নীলকণ্ঠ হয়ে ওঠে । আবিলতার সমস্ত স্তর অতিক্রম করে গাঁয়ে গিয়ে সে সমস্ত পৃথিবীকে পবিত্র অনুভব করে । তাইতো যে মুরতুজকে একদা সে যৌনতা দিয়ে পেতে চেয়েছিলো তাকে সন্যাসীর নিরাসক্তা দিয়ে সর্বসমক্ষে আদর করে । এটি মাধাই চরিত্রের মহত্তর উত্তরণ । এভাবে কিছু মানুষকে এগিয়ে চলতে হয় । এওতো একধরণের নবজীবন প্রয়াস ।

সবশেষে এরফানের উক্তির মধ্য দিয়ে, লেখক যেন শান্তি প্রার্থনা করেছেন ''আল্লা, জমি দিবার হয় দিও, না দেও সেও আচ্ছা। আমাকে আর জমির পিছে ছোটায়ো না।''(তদেব, ৫৪১) এই উপন্যাসে দেখা যায় দুর্জয় মূল্যবোধকে ভেঙে, বাড়ির গণ্ডির বাইরে নিয়ে এসে উদ্বাস্তু করলো। তা পরে দেশবিভাগে উদ্বাস্তু সত্তার জন্ম দিয়েছিলো। পুxxx পদ্মার বুকে যেন পুরাণের - উপনিষদের শান্তি প্রার্থনা যা কিনা নিশ্চিন্ততা - স্থায়িত্বের প্রার্থনারই অন্য নাম। উপন্যাসিকের মহৎ চিন্তাভাবনা ও শান্তিতত্ত্বের শিল্পরূপ উপন্যাসটি যেন এক অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। উপন্যাস আর 'এপিক' এখানে পরস্পরের আলিঙ্গনে একাকার। 'নির্বাস' এই উপন্যাসটি ১৩৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো। পরে ওই বছরেই পুস্তকাকারে বেরোয়। রাজনীতির একটা সক্রিয় সত্তা আছে। সরীসৃপের মত রাজনীতি, তার গ্রাসে যা কিছু পড়ে সবটাকেই সে কুণ্ডলীতে আবদ্ধ করে ফেলে। সর্বনাশা গ্রাসে হারিয়ে যায় অনেক কিছু। এককালে মানুষের আত্ম-প্রসারের তাগিদে রাজনীতি গড়ে উঠলেও এখন আর তা নেই। এখন রাজনীতির গ্রাসে পড়ে মানুষের জীবন খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে - ''রাজনীতি কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো এসে পড়ে। কারণ নিশ্চই আছে। সাইক্লোনের কি আর কারণ থাকে না ? কিন্তু যারা সেই আবর্ত ঝড় পড়ে তাদের তখন কারণ বিশেষণের কথা মনে থাকে না। পরেও ক্ষয় ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোর জন্য বেদনা অনুভব করতে করতে কারণ বিশ্লেষণের কথা কারো মনে পড়ে না। যদি কেউ তা করতে যায় তাকে হৃদয়হীন যুক্তি সর্বস্ব বলে সমাজে বিদ্রূপ করা হয়। যুদ্ধটা এমনি ব্যাপার। আর দেশ বিভাগ। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের চাইতেও নির্মম এই ব্যাপারে মন যেন কারণ খুঁজবার জন্য দিশেহারা হয়ে মাথা কুটতে থাকে। যুদ্ধের ব্যাপারটা অধিকতর দূরের বলেই

কি এমন হয় ? কিংবা এ ব্যাপারটা ধুঁকে ধুঁকে মরার মতো কিছু । মৃত্যু দুটোই । কিন্তু বজ্রপাতের মৃত্যু কি ধীরে ধীরে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে সচেতনভাবে এগোনোর চাইতে কম ক্লেশদায়ক নয় ? আর কখনই যেন ভোলা যায় না এর কারণ রাজনীতির সঙ্গে যেন কোনভাবে জড়িত, যে রাজনীতি এখনও শেষ হয়ে যায়নি ।''(নির্বাস, ৪২, ৪৩) বিমি, বিমলা, বিমলাপ্রভার অসংলগ্নচিন্তার ফসলগুলো অনেকটা এইরকম । মদনমোহন ক্যাম্পের পাশেই গড়ে ওঠা ছিন্নমূল মানুষের নতুন গড়ে ওঠা কলোনীর স্থানীয় স্কুল শিক্ষক ভুবনবাবুর সংসারের বিমি । সে দেখতে অনেকটা এইরকম - 'ও'নাকটা টিকলো, ছোট । নাকের বাঁদিকের উপরের ঠোঁটের উপরে তিলটা যেন আগের চাইতেও বড়ো হয়েছে । দু'গালেই কিছু কিছু মেচেতার দাগ পড়েছে । গায়ের রং তিন বছর আগে যে রকম দাঁড়িয়েছিলো তার তুলনায় যেন কিছু পরিষ্কার হয়েছে আবার । তা বলে পনেরো ষোলো বছর আগে যা ছিলো তার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না । সে কথা বলতে গেলে এও বলতে হবে, তিন চার বছর আগে হঠাৎ যেমন বুড়িয়ে উঠেছিলো সে তার তুলনায় এখন তাকে তরুণতর দেখাচ্ছে । অন্তত সেই চোয়াল প্রকাশ পাওয়া চেহারাটা আর নেই । কিন্তু চোখের কোলের সেই ক্লান্তির কালিটা লেগেই আছে । আর মুখের চেহারা তরুণতর হলেও কানের পাশে তিনটি সাদা চুল চিকচিক করছে ।আর চোখ ? চোখের দিকে চাইতেই সে দুটি টলোমলো করে উঠলো আয়নায় । তার চোখের মণি কালো নয় । নীলও বলা যায় না তাকে । ফিরোজা রং বরং । সূর্যের আলো কখন কিভাবে ধরছে তা যেন মণি দুটির দিকে চাইলে বোঝা যাবে । যেন আলো ধরে তারা বদলায় ।' (তদেব, ৪) সেই বিমলা যাকে একদিন রাজনীতির খেলার শিকার হয়ে বাবাকে ছেড়ে একমাত্র দিদি আর তার স্বামী ভুবনবাবুর সাথে রেঙ্গুন থেকে ব্রজযোগিনীর পথে রওনা হতে হয়েছিলো । মূলহীন

মানুষের মুড়ি ছেড়ে বহির্গমন । বাবা থেকে গিয়েছিলেন, হয়তো বা কাঠের কারবারটা দেখার জন্য কিংবা স্ত্রীর স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটা ত্যাগ করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না । পরিণতি মিত্রপক্ষেরা রেঙ্গুন দখলের জন্য যে সব বোমা ফেলেছিলো তার একটায় নিঃশেষিত হওয়া । তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ষোলো, মুখে মেছেতার দাগ ছিল না, শরীর হাল্কা ছিল, হাল্কা এবং নমনীয় কিন্তু দুর্বল নয় । দুর্বল হলে বাধার পাহাড় পেরিয়ে ব্রজযোগিনীতে পৌঁছানো হতো না । অথচ দিদিকে তার চাইতে মজবুত দেখালেও বাধার সামনে নুয়ে পড়তে পারে কি বলে পৌঁছাতে পারলো না তার লক্ষ্যে ।

ব্রজযোগিনীর জীবন ঘরহারা একরকমের বসত হলেও তার ভেতরে একধরণের প্রাণ ছিলো - ''ব্রজযোগিনীতে একটা আধুনিক আবহাওয়া নিজেদের জন্য তৈরী করে নিয়েছিলো তারা । বাড়িটা তৈরী করার সময়ে ধনীদের অনুকরণে মধ্যবিত্তরা যা করে তেমন কোন বনেদিআনার চেষ্টা করেনি ভুবনবাবু । বরং কংক্রিটের ক্যাটালগে যেসব বাড়ির ছবি ছাপা থাকে তেমনি একটা চার কামরার ছোট একতলা বাড়ি উঠেছিলো মাটির পথের ধারে । ঘাসে ঢাকা একটা লন ছিলো । জানালাগুলোর কোন কোনটায় কাচের শার্শি বসানো হয়েছিলো । ভিতরের দিকে বারান্দার টবে ফুলগাছ ছিল কয়েকটি । আর উঠানে [illegible] এঘর থেকে ওঘর যেতে গেলে নজরে পড়ে এমন জায়গায় রজনীগন্ধার চাষ ছিল । অচল সিকি দিয়ে দোকান থেকে যেরকম কিনেছিলো একদিন সে তেমন শুকিয়ে ওঠা কিছু নয় । চা ভিজিয়ে দিয়ে যে অবসর পাওয়া যায় তারই মধ্যে কাঁচি হাতে উঠানে নেমে একগোছা রজনীগন্ধা কেটে এনে চা টেবিলের ভাসে সাজিয়ে দিতে পারতো সে ।''(তদেব, ২৬, ২৭) কিন্তু সে প্রাণও রক্ষা করা গেলোনা । রাজনীতি আর ধর্মের উন্মাদনা আবার বেড়ে ওঠা ক্যাকটাসকে উন্মীলিত করে দেয় ''কোথা থেকে কি যেন হয়ে গিয়েছিলো । গাড়ীটা হঠাৎ থেমে গিয়েছিলো

নিস্তব্ধ ঝিঁ ঝিঁ ডাকা একটা মাঠের মধ্যে। কোথায় এলাম বুঝবার উপায় ছিলো না। গাড়ির হলুদে আলোয় রেলপথের ধারের ঝোপঝাড়কে গভীর করে দেখাচ্ছিলো। তারপর কোলাহল আর আর্তনাদ সুরু হলো। এঞ্জিনের দিক থেকে গার্ডের গাড়ির দিক থেকে। অনেক কণ্ঠের উল্লাস রব, অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ। জানালা দিয়ে মুখ বার করে পাশের ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় সাহেবদের লক্ষ্য করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভালো করে কিছু দেখবার আগেই বাইরের হেঁচকা টানে তাদের কামরার দরজাটা খুলে গেলো। বাইরের সেই উল্লাস রব আর আর্তনাদ এবার বুকের পাশে। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেলো। যে বউটির সঙ্গে গল্প করেছিলো সে তক্ষণ তার কথা মনে আছে। আঁতকে সে তার স্বামীর একখানা হাত চেপে ধরেছিলো। তাকে যখন গাড়ী হতে থেকে টেনে নামাচ্ছে তখনও সে সংজ্ঞাশূন্য স্বামীকে ধরে আছে। তার স্বামীর দোমড়ানো মোচড়ানো দেহটা শেষ পর্যন্ত আধখানা গাড়ির মধ্যে আধখানা পাদানির উপর ঝুলতে লাগলো। গাড়ির সব আলোগুলো নিবে গিয়েছিলো। উল্লাসকারীদের হাতে টর্চ জ্বলছে। অসংখ্য টর্চের আলোয় তারা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিমলা হয় ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিলো কিংবা ওইভাবেই তাকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। তার পাটা মচকে গিয়েছিলো। উঠে দাঁড়াতে পারলো না। পড়ে গেলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। উঠে দাঁড়িয়ে কি হবে মানুষ তা ভাবে না। তার শাড়ীxxxখানা ফালাফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। মচকানো পাটা সে মাটিতে পাততে পারলো না। আবার এক শ্বাপদের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সে পড়ে গেলো। চারিদিকে শ্বাপদের চোখ-টর্চগুলো জ্বলছে। দুড়দাড় করে তারা এমাথা থেকে ওমাথা ছুটছে। কে একজন তার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেলো। এর একজনের বুটের ধাক্কা লাগলো তার মুখে। তারপরে দু তিনজনে এসে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল ঁ তাকে ঘিরে। কয়েকজোড়া হাত তার হাত পা মাথা চেপে ধরেছিলো।

জ্ঞান হওয়ার মতো একটা ভাব হয়েছিলো, বোধ হয় তখন শেষ রাত । আকাশে দু'একটি তারা । কোমর থেকে পা কি ট্রেনে কাটা গেছে ? বুকের মধ্যে খচখচ করে বিঁধছে নিঃশ্বাস নিতে । শুকনো ঘাম হাতে লাগলো । পায়ের দিকটা কি ডোবায় ? মাটিটা সেদিকে ভিজে । তারপরই আবার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিলো ।'' (তদেব, ৩৯, ৪০) ধর্ম আর রাজনীতির যেন হাতে হাত ধরে পথচলা । ধর্মের শেষ আর রাজনীতির আরম্ভ এ দুটোই এক বিরাট প্রশ্ন । ধর্ষিতা হয়ে আশ্রয় পাওয়া গেল ফাদার ফিলিপটের মিশনে । সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিক ম্যাকব্রাইডের কাছে এই দাদার উপস্থিতার পেছনে ইংরেজ প্রশাসকদের কোন দায় ছিল না একথা তাকে দিয়ে স্বীকার করালেন যদিও প্রকৃত সত্য তার সম্পূর্ণই তার জানা ছিল । আবার পঞ্চাশোর্ধ্ব সহকারী যাজক বেঞ্জামিন পযায় কামনা করলে প্রগাঢ় অন্ধকারে বিকেলের চেনাপথ আন্দাজ করে ছুটতে হয়েছিল তাকে । আলের পথে কাঁটা ছিল, তারপর নদী । কপোতাক্ষ পার হয়ে তিনদিন তিনরাতের চেষ্টায় বনগাঁ । রেলস্টেশনে তখন হাজার হাজার হাজার লোক । ভিটেমাটি [illegible] উৎখাত হয়ে এক সবল চক্রান্তের [illegible] অসহায় শিকার সবাই । ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, কালিপড়া হাঁড়িকুড়ি, [illegible] দড়ি দিয়ে বাঁধা, জড়ানো, মলিন মাদুর, কাঁথা । রুগ্ন অভুক্ত, অস্নাত হাজার লোকের পুতিগন্ধ জনতা । সেখানেই অসুস্থ বিধি পেয়েছিলো মরণচাঁদ, সোদামুনি, শ্রীকান্তের দলটিকে । আশ্রয় পেয়েছিলো যেন । যে কলকাতা যাওয়া ছিলো সবার স্বপ্ন সেখানে আর কেউ গেলো না । কলকাতার উদ্বাস্তুদের মর্মান্তিক দুরবস্থার সংবাদ পিছিয়ে দিলো তাদের । কলকাতা যাবার পরিবেশ রক্ষিত ছিলো যেখানে সে হাউই-এর সব বারুদ পুড়ে যাবার মতো অবস্থাই কি হয়েছিলো তার ? প্রায় একবছর পথে পথে ঘুরে মলুদপোহন ক্যাম্প । ক্যাম্পে পৌঁছাবার আগেই এক স্কুল বাড়ীতে মনের কাছে হেরে যাওয়া বিধি সমাজে মিথ্যে

স্থিতি পাবার জন্য, নিজেকে রক্ষা করা - প্রতিরোধ গড়ার জন্য ঘোষণা করেছিলো সে ভুবনবাবুর স্ত্রী. ''স্কুলের একটা ঘর কেউ দখল করে নি । ঘরটা দেখলে তালা দেওয়া বলে ভুল হয় । এই বোধ হয় কারণ । কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে ঘরটা খুঁজে বার করেছিলো সে । আর সেই ঘরে ভুবনবাবুর বিছানা পেতে দিয়েছিলো । যত্ন করে বিছানা পাতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিলো যেন সেটা অনেকদিনের প্রায় পরিচিত শোবার ঘর । অনেক রাত্রিতে নয়, প্রথম রাত্রিতেই যখন সে ঘরে এলো বিমলা, তখন বিছানার উপরে ভুবনবাবু বসে আছে । হাঁটুর উপরে চিবুক রেখে সে-ও যেন সেই তারার আলোর মতো অন্ধকারে অবাক হয়ে আছে । রজনীগন্ধার ফুলের গোছাটা স্কুলের বারান্দায় রেলিং'এ ভর রেখে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে করতে একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলো সে । ঘরে ঢুকে বললো, 'ভুবনবাবু, তোমার একখানা ধুতি দাও' ।বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের ছেঁড়া ব্লাউজ ও ময়লা শাড়িটা ফেলে দিয়ে ভুবনবাবুর ধুতি গায়ে জড়িয়ে সে যখন ঘরের অন্ধকারে [illegible] ফি রে গেলো তখন তার হাত পা কাঁপছে । ... ক্লাস এইটের ঘরের উদ্বাস্তুদের চোখের সামনে সে রাত্রিতেই মিথ্যা এই ঘোষণা করেছিলো - সে ভুবনবাবুর স্ত্রী ।''(তদেব, ২৫, ২৬)

পথ চলায় কিছু কিছু অনিয়ম দেখা দেওয়া স্বাভাবিক । সামাজিক সব সংস্কার পুঁথিপত্র বজায় রাখা সম্ভব হয় না । এমন কি নিজের অদ্ভুত ঠেকলেও ''বিমলা বললো, 'আমরা অদ্ভুতভাবে স্বাধীন হয়ে গেছি, ভবতোষবাবু, তা কি লক্ষ্য করেছ ? আমার সরকারি চাকরি সত্ত্বেও ? আরে না । ওদিকে যেয়ো না । সে স্বাধীনতা বনে জঙ্গলেও খ পাওয়ার পথ নেই । জঙ্গলের কুটির তোলার জায়গা, কুটির বাঁধার গোলপাতা বা বুনো ঘাস সবই সরকারের । আমি বলছি আমার এবং তোমার ব্যাপার । আমার সেই সতীক ভেটাঘণাইদের আর কোন পাত্তা নেই । এই দু'জনে

আছি - কারো কিছু বলার নেই ।"(তদেব, ১৪)

হলুদমোহন ক্যাম্পে যে মানুষগুলোর সাথে পরিচয় হয় বিমির, মনে হয় তারা একটা পচনশীলতার আবহাওয়ায় অনিবার্য ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । এদের বাঁচবার একমাত্র পথই হলো অন্য কোথাও বসত করা । কিন্তু সে দেশ কোথায় ? আমি কোথায় পাবো তারে ? রাজনীতি উত্তর অস্পষ্ট করে । পদ্মাকে না পেয়ে এরা আকুলি বিকুলি করছে । পদ্মা যেখানে প্রবাহিতা সেটিই তাদের দেশ । তার বাইরে পৃথিবী থাকতে পারে, দেশ নেই । পদ্মা যেন তাদের শিরায় বয়ে যাওয়া রক্ত । এই ক্যাম্পেই পরিচয় হলো কার্যপরিচালক উদার-প্রকৃতির অজয়বাবুর সাথে, ছেলের কল্যাণের জন্য ছেলেকে লিখে পড়ে অন্যের কাছে দিয়ে মনে মনে স্থিতিহীন মুরথ দম্পতির সাথে, যক্ষা-রোগাক্রান্ত মোহিতকে বাঁচাতে গিয়ে বহুচারিনী আশ্রয়হীনা স্ত্রী লতার সাথে যার জেদ ছিলো রোজ রোগ যা ক্ষয় করবে সে থাবা থাবা মাটি তুলে সেই ক্ষয় ঢেকে দেবে, সৌম্য গুহ'র সাথে, সেই সৌম্য যার মুখে দাড়ি ছিলো এবং সেটাই কমনীয় নরম করে রেখছিলো তার মুখকে । যে হঠাৎ হাত ধরলে ঝলাৎ করে একঝলক রক্ত উঠে আসতো বিমলার কান পর্যন্ত । সৌম্যের চেষ্টায় সোয়েথয়েট চা বাগানে লেডিওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের চাকরি পায় বিমি । সাথে সুন্দর একটি পুরাণো বাংলো । সেখানে বাতাসে ঝিল ঝিল করে কাঁপে ঘাসের ডগা । জোর বাতাস হলে জলের মতো তরঙ্গে মাতামাতি করে ঘাসের বুক । সেখানে জলকে অনুভব করা যায়, নিজেকে দেখা, অনুভব করা যায় । এই নিশ্চিন্ততায় আর সৌম্যের সান্নিধ্যে বিমির উদ্বাস্তু মন পুনর্বাসন পেয়েছিলো "তোমার উদ্বাস্তু মন এখানে পুনর্বাসন পেলো ।

তা বলতে পারো । বসো আলো জ্বেলে আনি ।

কি এমন তাড়াতাড়ি ?

গাড়ি ছেড়ে দেবে ।

নাই বা গেলে আজ ক্যাম্পে ।

থাকবো কোথায় ?

এই বাসায় ।

আলো জ্বালার আগে বিদায় নিলো সৌম্য । সন্ধ্যা তখন ফেরা পাখির ডাকে এগিয়ে আসছে । প্রান্তরে আলো আছে, বাড়িটার বারান্দায় অস্পষ্টতা । সৌম্য চলে যাচ্ছে । আলো পড়ছে তার গায়ে ।

অন্ধকার হয়ে আসা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে বিথি, দুহাতে দুহাত জড়ানো, আড়াআড়ি রাখা বুকের উপরে । চারিদিকে থমথমে প্রকৃতির উপরে সন্ধ্যা নেমে আসছে । বাঁদিকের ঘাসগুলো নড়ছে । অস্পষ্ট ধ্যাক ধ্যাক করলো কেউ । শেয়াল বোধ হয় খরগোশের খোঁজে । ডানদিকে পিঁড়াটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে । আলোটা বারান্দায় টেবিলের উপরে এনেছিলো, কারণ সেখানেই চা এসেছিলো । আলোটা জ্বাললো সে । নিঃসঙ্গ বাড়ির নীরব পরিবেশ । চুপিচুপি । কি একটা জন্তু ভয় পেলো । অন্য কোন জন্তু শিকার ধরেছে । চাপা গরগর শব্দ । নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা যেন এই অরণ্যেরই কোন যাত্রী । অনেক আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্তির অনেক দূর পথ চলার যাত্রার দুরন্ত । নিঃসঙ্গ যাত্রী দৃপ্ত দৃপ্ত গর্জন করে অগ্রসর হচ্ছে বনপথে । কিছু ক্লান্ত অভিজ্ঞতায় পরিতৃপ্তির আনন্দে লাঙ্গুল দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করছে । নিঃসঙ্গ অন্ধকার । কিন্তু এই নিঃসঙ্গ অরণ্যের সে ঈশ্বরী ।'' (তদেব, ১০৬, ১০৭) মনে হলো এইবার সব সার্থকতা পাবে । জীবনে এতদিন যা ঘটে গেছে তা নেহাতই অভিজ্ঞতার কিছু রূঢ় আঘাত । এবার নতুনভাবে বাঁচবে সে ''শুধু বাঁচা নয় । প্রাণ বিকিরণ করার মতো তারুণ্য ফিরে পাওয়া যেন মনের । যেন বলা যাবে, এত বেদনা এত কষ্ট, সার্থকতার এই পথে এসে দাঁড়িয়ে সবাই তপস্যার মতো মূল্যবান হয়ে উঠবে । কত আশা মানুষের জন্য । কত আশা এই পৃথিবীর । এই পৃথিবী যেন আবার নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে । এতদিন শুধু

কিছু সময় নষ্ট হয়েছে বৈ তো নয়। তাকেই বা ব্যর্থ বলা হবে কেন? অভিজ্ঞতারই বা কি কম মূল্য?'' (অদেব, ১১২) অথচ কোথা থেকে কি যে হয়ে গেলো। সৌম্য তাকে রাজনীতিতে টেনে নামালো। চা বাগানে ধর্মঘট হলো। চাকরি গেল তার। যাদের হয়ে সে সব করলো তারা তাকে একটুও সহানুভূতি দেখালো না। ধর্মঘটের মধ্যেই একদিন কোথায় চলে গেলো সৌম্য। হয়তো অন্য কোন শহরে অন্য কাউকে মিষ্টি করে ডেকে নতুন ধর্মঘটের ব্যবস্থা করতে। এখানকার বিমলা তার কাছে ব্যবহারশেষের মৃৎপাত্র। কি লজ্জা কি লজ্জা। ধরা পড়ে সৌম্য কাঠগড়ায় উঠলে অন্তঃস্থ ভ্রূণের নিষেধ সত্ত্বেও বিমি কাঠগড়ায় উঠলো। সাক্ষ্য দিলো সৌম্যের বিরুদ্ধে। যে সন্তান এলো সেতো বিশ্বাসভঙ্গের, পুনর্বাসন ভেঙে যাবার। একে বিমি বরণ করে নিতে পারলো না ''মেট্রন এলো। 'কেমন আছেন - ভালো? আপনাকে [illegible] ট্যাক্সিতে ওরকম ছুটে [illegible] আসতে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। ও অবস্থায় ও রকম করতে নেই। যাক, এসে ভালোই করেছিলেন। কিন্তু একটা খবর আমরা পাইনি।' মেট্রন কুণ্ঠিত হলো।
'হেঁয়ালি নয়। যে নামটা বলেছি - ভুবনবাবু আমার ভগ্নীপতি।'
মেট্রন সরাসরি চাইতে পারলো না।
'না। সেও নয়। কিন্তু, আমি কারো বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সাবালিকাও বটে।' হাঁপাতে লাগলো ছিহি বিমলা। ... মেট্রন চলে গেলো। কেবিনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বিমি। পায়চারী করতে লাগলো সে। চলতে তার কোনদিনই দুর্বলতা নেই। রেসুর বুজযোগিনীর পথ তাকে শক্ত করে দিয়েছে। নাগকেশরের পাতাগুলো লাল। যতই দেখো ততই সুকুমার বলে বোধ হবে। লাল পাতাই ছিল। আর তখন বসন্তও বটে।

কাঁচের জানলা ছিলো হসপিট্যালেরও। জানালার ওপারে তার শয্যা। সন্ধ্যার আগেই মৃদু আলোটা জ্বলছে। সাদা ধবধবে

বিছানায় বাদামী রঙের কম্বল। লোহার ছোট খাট। যেন ছবি। ঘুমন্ত শিশুটি দু হাত তুলে রেখেছে মুখের সামনে। কোন কাল্পনিক বিপদ থেকে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নাকি ওটা। বারান্দায় পায়চারি করছে বিমি। একটু শীত শীত যেন করছে। অন্ধকার * ওপারে কবোষ্ণ নিশ্চিন্ততায় সে ঘুমুচ্ছে।

বারান্দা থেকে লনে নামলো বিমি। আরও দু একজন রোগীও বেড়াচ্ছে তার মতোই। কম্পাউন্ডের বেড়াটার তার এদিকে খানিকটা ছেঁড়া।

বিমি কম্পাউন্ডের বাইরে এলো। পথ ধরে চলতে গিয়ে ফেরারী আসামীর মতোই সে সতর্ক হলো। রাত হলো। হাঁটতে লাগলো সে। কোথায় যাবে? বাস্তুহারা কোথায় যায়?'' (তদেব, ১৩০, ১৩১) মরনচাঁদের মাসী তার আঁশওঠা শরীর নিয়ে এক ফুটফুটে নরম নরম হাত পা সন্তানের জননী। গোদামুন্সির বিশ্বাস এ তার নিজের হতে পারে না। হয়ত বা কুড়িয়ে পাওয়া কিংবা হাসপাতাল থেকে চুরি করে আনা। হয়তবা এ সন্তানের জননী বিমি, পুনর্বাসনহীনতা যাকে একমুঠো হাসির আশ্রয় হতে দিলো না। রাজনীতির অমোঘ খেলায় মলুমমোহন ক্যাম্পের সবাই সরকারী বাসে করে দণ্ডকারণ্যে যেতে থাকলে মরনচাঁদের মাসীর ছেলেকে ফেলে পালাতে থাকে সবাই। বিমলা আবেগে অস্থির হয়ে ক্যাম্পের অধিবাসী না হয়েও তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাসে ওঠে বসে। অপরিচিত বাঁধনে ছেলেটি শব্দ করে কাঁদতে থাকে - হাত ছাড়াতে চায়। বিমি বুঝতে পারে এ হবার নয় ''সময়ের আশ্রয়বিন্দু থেকে একবার স্খলিত হলে আশ্রয় পাওয়া যায় না। যাকে ত্যাগ করেছ তাকে কি আর আপন করে পাওয়া যায়? মরনচাঁদের ছেলেকে নিয়ে তুমি অনেক কল্পনা করতে পারো। যে সম্বন্ধ তুমি নানাভাবে মুছে দিয়েছ

তা আর ফিরিয়ে দিতে তুমি পারো না ।''(তদেব, ১৪৮) তাই তাকে বাস থেকে নেমে আবার ফিরে আসতে হয় ভুবনবাবুর পাতা সংসার সংসার খেলায় যেখানে তার শরীর মনের কোন আশ্রয়ই নেই অথচ একধরণের পার্টনারশিপে তাকে বাকি জীবন বসতি করে যেতে হবে ।

হলুদমোহন ক্যাম্পে যে সব মানুষ ছিন্নমূল হয়ে তাদের এক সময়কার জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে আশ্রয় পেতে চেয়েছিলো রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম কেউই তাদের তা পেতে দেয় নি । অর্থ উচ্চরণ করে সুরথ সমাজ ভ্রষ্ট হয়ে ছেলের কল্যাণের জন্য তাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে স্মৃতি বিচ্যুত হয়েছিলো, লতা মোহিতবাবুর শরীরটা সারিয়ে দিতে গিয়ে নিজের শরীরটা অন্যদের বিলিয়ে দিতে দিতে একসময় অভিনয়টাকেই আসল ভেবে পালিয়ে আশ্রয়হীনা হয়েছিলো ''নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বর্ষার জল চলতে দেখেছে বিমলা । শৈবালজাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদকে প্রায়ই সে ভেসে যেতে দেখেছে জলের স্রোতে । ডোবার শ্যাওলা, স্রোতে বাঁচে না, মাটির দিকে ঝোঁকে । বর্ষায় ডোবা আর নদীর খাত একাকার হয়ে গেলে তারা ভেসে পড়ে । নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছে শৈবালজাতীয় পাড়ের দিকে এসে যেন মাটি কামড়ে ধরতে চায়, দু এক মুহূর্ত পারেও তা, তারপরেই আবার স্রোতের টানে ভেসে যায় । লতা ভেসে গেলো ।''(তদেব, ৭২) । মদনচাঁদ সারাটা জীবন ঘর তৈরীর সাধনা বুকে পুষে তাকে রূপ দিতে পারে নি । মালতী ঘরহারা মানুষদের রাজনীতিতে টেনে এনে আশ্রয় দিতে চেষ্টা করলে বিমলার কাছে শুনেছিলো ''আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয়, জানো, আমরা পৃথিবীর কিছুই বুঝতে পারলাম না । রাজনীতির সুতো টানছে কেউ আর আমরা হাত পা ছুঁড়ছি । ভাবছি সেটাই বাঁচা ।''(তদেব, ২১) কিন্তু সে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলো ''আমরা এই শহরের প্রত্যেকটি লোকের কানে তুলে

দেব এই উদ্বাস্তুরা যেতে চায় না, তাদের জোর করে তাড়ানো হচ্ছে। ভাবো দেখি, বউদি, ভুবন্ত লোক নৌকার একটা পাশ চেপে ধরেছে আর ভুমি তার হাতের উপরে মেরে মেরে তার হাত ছাড়িয়ে দিচ্ছ।''(তদেব, ৪৩১) কিন্তু তা সফল হলো না। ক্যাম্পের সবাইকে যেতেই হলো অনির্দিষ্টের পথে - দণ্ডকারণ্যে। হয়ত সেখানে পুনর্বাসন হবে আবার হয়ত বা হবে না। রাজনীতির কলে বাঁধা অসহায় আমরা। মানুষ রাজনীতির দাবার ঘুঁটি। যারা রাজনীতি পরিচালনা করেন এর আঁচড় তাদের গায়ে লাগে না। কোনদিন লাগবেও না। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের বুকের রক্তে রাজনীতির রথ এগিয়ে যাবে। হলুদমোহন ক্যাম্পের অধিবাসীদের মতো একদল পুনর্বাসন প্রত্যাশী মানুষ আর মালতির মতো নিষ্ঠাবতী কমী রথের চাকার দুপাশে দুহাত মেলে হাঁটু গেড়ে চিরকাল প্রার্থনায় প্রত্যাশী।

রাজনীতি উদ্বাস্তুকে বাস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে না। আবার বর্তমান জীবনের গঠনপ্রকরণ এইরকম যে মানুষ চাইলেও আজ আর রাজনীতির হাত এড়াতে পারবে না। কিন্তু জীবন অবিচ্ছেদ্য এই রাজনীতি জীবনে কি এনে দিতে পারছে? রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে এই রাজনীতির কবলে অসহায় দুর্বল মানুষ খড়কুটোর মত ভেসে চলেছে অবিরাম। অথচ যারা এর পরিচালক রাজনীতির চোরাটানে তাদের অস্তিত্ব কোনভাবেই বিচলিত হয় না। আর যারা ইচ্ছায় হোক, বাধ্য হয়ে হোক, এর টানে ভেসে চলেছে তারা রাজনীতির ও ধর্মের পরিচালকদের হাতের পুতুল। ভাসতে ভাসতে নতুন জীবনের খোঁজে এদের বাস্তু গেছে এটাই বড় কথা নয়, এদের সব রকম মনুষ্যত্ব - মূল্যবোধ স্থানচ্যুত হচ্ছে এটাই বড় কথা। রাজনীতির যুপকাষ্ঠে এদের অবিরাম বলিদান। যদিও এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে অনন্ত খোঁজই এদের ভবিতব্য।

মহিষকুড়ার উপকথা উপন্যাসটির রচনাকাল শ্রাবণ ১৩৮৫। উপন্যাসটি ১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। মাটি ও কৃষ্টির মেলবন্ধন সভ্যতার উষালগ্ন থেকে। উত্তপ্ত গলিত নানা জিনিস জমে গিয়ে যেদিন থেকে মাটির জন্ম হয়েছে সেদিন থেকে প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিলো প্রাণসৃষ্টির। তারপর ক্রমবিবর্তনের সূত্র ধরে এসেছে মানুষ দখল নিয়েছে নতুন পৃথিবীর। গহন অরণ্য থেকে একদিন যে পদযাত্রার শুরু তার পরিণতি বর্তমান সভ্যতায়। চলেছে নিরন্তর লড়াই, রাজতন্ত্রের সাথে প্রজাতন্ত্রের, সামন্ততন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্রের। এ যুদ্ধ বাইরের দিক থেকে যেমন শাসক শক্তির সাথে শোষিত জনতার আবার অন্তরের দিক থেকে মানুষের মনের ভেতরে নিরাশ্রিত এক পর্যায় থেকে আশ্রয় পাবার জন্য আর এক নিশ্চিন্ত আশ্বাসের মধ্যে। এভাবেই মানুষ এগিয়ে চলে, তার কৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধন হয়। শুরুতে যে অরণ্যের কোন মানুষের নির্ভরতার আশ্রয়স্থল ছিল আজ আর তা নেই। মানুষের লালসার রক্তাভ আগ্রাসনে পৃথিবীর আদিম কৌমার্য ছিন্নভিন্ন মলিন নতজানু হয়ে গেছে। এই সত্য যখনই মানুষের চোখে পরিস্ফুট হয় তখনই মানুষের মনের মধ্যে নামে ধ্বংস, রমনীর নিটোল স্তনে তার পুরুষের যে আশ্রয় সে আশ্রয় কেড়ে নিলে যেমন তেমনি অসহায়তা। নির্মল উন্মুক্ত পৃথিবীর মালিকানাহীন বাস্তুহীনতা তাড়া করে ফেরে সেসব মানুষকে। সভ্যতার অগ্রগতির বোধহয় অন্য নাম তাই আগ্রাসন। কবি জীবনানন্দের ভাষায় ''পৃথিবীতে সুদ খাটে, সকলের জন্য নয়। অনির্বচনীয় হুন্ডি দু একজনের হাতে।পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবী এসে।সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।''[৬] এই আগ্রাসন প্রতিরোধের লড়াই রক্তমাংসের জীবনের উষ্ণ স্বাদ পেতে চায়। উন্মুলিত মানব সমাজ অধিকারভোগী নিষ্ঠুর আধিপত্যের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে শক্ত পড়ার গর্জন তোলে। শোষকের চাপে পড়ে যে সুকুমারপ্রবৃত্তি ভাঙতে

শুরু করেছিলো আত্মশক্তি দিয়ে মানুষ তার উর্ধ্বে উঠে জয়গান গাইবার চেষ্টা করে। ফলাফল যাই হোক না কেন এই যে আত্মউপলব্ধি, মিথ্যা রহস্যময়তাকে সরিয়ে দু'চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা এইতো একধরণের ফিরে আসা। সাধকের উপলব্ধি যেমন করে সংসারে ফিরে আসে, গৃহীর উপলব্ধি যেমন করে সাধনায় ফিরে যায়। নিরাশ্রিত জনমণ্ডলীর এমনই এক আশ্রয় উপলব্ধির কথা মহিষকুড়ার উপকথা।

গল্পের শুরুতে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন মহিষকুড়ার সাথে "আমাদের এই গল্পটা মহিষকুড়া নামে এক নগন্য গ্রামকে কেন্দ্র করে। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। এত ছোট, এত নগন্য, চারিদিকের জঙ্গলে এমন ঘেরা যে তাকে আবিষ্কার করার জন্য জীপ গাড়ির বহর সাজিয়ে অভিযান করলে মানিয়ে যায়, বরং সুখ ও মৃদু উত্তেজনার কারণ হয় : বনের হিংস্র জন্তুদের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পিকনিকের আবহাওয়ায় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, কারণ মনে হতে থাকে এরা বোধহয় বনে পথ হারিয়ে এক মানব গোষ্ঠীর মহৎ বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে।" (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ-১) গ্রামের নাম মহিষকুড়া হবার কারণ হিসেবে লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে বহুকাল আগে এখানে বন থেকে বুনো মোষেরা এসে আড্ডা জমাতো। 'কুড়া' শব্দটির অর্থ ডোবা বা দোলাজমি কিংবা দহ অর্থাৎ নদীখাতের গভীরতর অংশ হতে পারে। নদীর পাশে মহিষ আসার জন্যে হয়তবা নাম হয়েছিলো মহিষকুড়া। জলের ধারে আধডোবা চর, ও ঘাস বনে ছিল বুনো মোষদের আড্ডা। বেদিয়াদের প্রাণ হাতে করে সেখানে আসতে হতো। গ্রামের নামের কথা বলার সাথে সাথে গ্রাম প্রসঙ্গে বনের

ইতিহাস এসে পড়ার কৈফিয়ৎ ''কারণ বন থেকে এইসব গ্রামকে আলাদা করা যায় না।''(তদেব, পৃ-৪) ''সেই মোষগুলো কিংবা সেই মানুষগুলো কোথায় গেল কেউ জানে না। এখনো এ অঞ্চলে মোষ আছে, তবে তা কারো না কারো বাথানের, অথবা কারো না কারো গাড়িটানা, লাঙলটানা মোষ।''(তদেব, পৃ-৬) সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের লালসার গ্রাসে বিসর্জিত হয়েছে সমস্ত অরণ্যানী। লাঙল সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্ন না হয়ে আগ্রাসনের চিহ্ন হয়ে ওঠে। অবাক লাগলেও এটাই ধ্রুবসত্য। এর হাত থেকে মুক্তি নেই কারো ''যারা বনের বুকে কুড়ুল চালায়, গরম পীচ ঢেলে ও সড়ক তৈরী করে আর যারা লাঙলের পিছনে ধৈর্য্য ধরে এগোয় তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাই-এর তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়, লোভের লাঙলে পড়লে তেমন যে শাল - সেগুনের নিরেট নিশ্ছিদ্র ব্যূহ, এক বনস্পতির এলাকা থেকে অন্য বনস্পতির এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিষমুখ কাঁটালতার তেমন যে সব ব্যারিকেড - সব ধুয়ে যায়।''(তদেব, পৃ-৩) এখন সমস্ত জমি, বনের মালিকানা কারো না কারো। দখল হওয়া এই মাটিতে উন্মূলিত মানব সত্তার কোন স্বাধীন অবস্থান সম্ভবপর নয়। অধিকারী অন্য কোন বিত্তবানের কাছে তাকে নতজানু হয়ে থাকতেই হয়। তাই গভীর অরণ্যের ঘেরাটোপে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো মহিষকুড়ার জীবনও আপাত স্থির, প্রশান্ত। যদিও সেখানে এক দারুণ বন্য হিংস্রতা আছে যা মানুষের হিসাবকে মাঝে মাঝে ওলট পালট করে দিতে পারে।

এ কাহিনীর চরিত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। জাফরুল্লা, আসফাক, কমরুণ, বাউটিয়া, মুন্নাফ, ছমির, মাস্তার, নুরী এবং আরো কয়টি অপ্রধান চরিত্র আছে। মহিষকুড়ার প্রাচীন অর্থনীতির সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জাফরুল্লা ব্যাপারী। এককালে জাফর নিজে লাঙল ধরতো

কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন হয় না। প্রায় আটশো বিঘা জমির মালিকানার দখল তার। জাফরুল্লার মোষের বাথানে কাজ করে চাউটিয়া বর্মন "মোষের বাথানে কঠিন কাজগুলোর ভার চাউটিয়ার উপরে। দুধও দোয়ায় সে। আর দুধ দোয়ানো হলে সেই দেয় দুইমন দুধ বাঁকে নিয়ে শহরের দিকে যায়।"(তদেব, পৃ-১৪) পিতৃপুরুষের ব্যবসা ছিলো 'কান্দী', অথচ বুড়ো মোষ না ধরে ধরে যার সবটাই এখন বিস্মৃতিপ্রায় "কান্দি কিন্তুক সে মহিষ বাথিষর পায় না।" (তদেব, পৃ-১৮) জাফরুল্লার বাবা ফয়েজুল্লার আদেশে ত্রিশ বছর আগে বুনো বাইসন বা 'দেয়াশী' মোষ বাথানে হানা দিলে নেংটি পরে বুকে হেঁটে প্রাণ হাতে করে বাথান বাঁচাতে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। ফয়েজুল্লার বাথান জরা মোষ তাকেই বাঁচাতে হবে কারণ সেতো ক্রীতদাস। নুরী ঝি দীর্ঘকাল এই পরিবারে কাজ করে চলেছে। কাজের প্রচন্ড চাপের মাঝে তার জীবনের অন্য কোন অর্থ ছিল কি না জানা যায় না। হয়ত বা ছিল, হয়ত বা ছিল না। প্রভুর কাছে সমর্পিতা ক্রীতদাসীর জীবনতো আসলে জন্তুর মতই ভারবহ - "সকালে একপেট পান্তা খেয়ে সে তার গোবর কাদার চারি আর পাটের নুড়ি নিয়ে নিকোতে শুরু করে। এ ঘর সে ঘর করে সব ঘরের ভিটা, মেঝে বারান্দা, তারপর উঠোন। য় পাঁচ ছ ঘন্টা একটানা কাজ করে। গোবরকাদার চারিটাইতো আধমনি হবে ওজনে। অবলীলায় সেটাকে সরিয়ে সরিয়ে সে উবু হয়ে বসে লেপে যায়। তার নিজের ওজনও মনদুয়েক হবে। দরকার হলে খড়িও ফাড়তে পারে, যদিও নাকছাবি, কপালের চুল আর থলথলে প্রকান্ড প্রকান্ড বুক দেখে বুঝতে পারা যায় সে মেয়েমানুষ। চাকরদের মহলে ঠাট্টা, সে এক মাদীমোষ যে মানুষের মতো কাজ করতে শিখেছে।"(তদেব, পৃ-৪৭, ৪৮) ছমিরের কাজ খড়ি ফাড়া, তরকারির বাগান দেখাশুনো করা, হাঁসমুরগী দেখে রাখা। ক্সাইঁ-এর কাজটাও ছমির করতো। যে কোন পশুর জবেহ করা,

ছাল ছাড়ানো তার দায়িত্ব। তাছাড়া বছরে একদিন নির্দিষ্ট কিছু পশুকে খাসী করতে হতো। নিজেদের নিষ্ফলা জীবনের সাথে সাদৃশ্য থাকায় ছমির এই পরবটার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো। সর্দার তার নসিরের কাজ তামাকের খেতে - তারা নাঙলদার। অন্যান্য চাকরদের মতই শোষণক্লিষ্ট তাদের জীবন। সেখানে কোন বৈচিত্র্য নেই। গল্পের প্রধান চরিত্র ও যার চোখ দিয়ে অন্য সব চরিত্রদের সাথে ঘটনার বর্ণনা করেছেন লেখক তার নাম আসফাক। বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়স হবে। [illegible] রোগা লম্বাপানা হলদেটে চেহারা। চোখ দুটো টেরচা জন্যে উপরের পাতা দুটো বড় বলে মনে হয়। চিবুকের খোটা দশ পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। আসফাক থাকে জাফরুল্লার চালাঘরে যেখানে নাকি অন্য ছ জোড়া বাছাই বলদ থাকে। পশুদের মতই মালিক জাফরের অনুগত আসফাক। অথচ মাত্র সাত আট বছর আগেও এরকম উপস্থিত জীবন যাপন করতে হয়নি তাকে। বুড়ো মা'র মৃত্যুর পরও তুলনায় জোয়ান বাপের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছিল। ''বাড়ী বলতে একখানা খড় - পচা পুরোনো চৌরী ঘর, যার বারান্দায় রান্না হতো। অন্য আর একটা ঘর ছিল যার বেড়া ছিল ফাটান বাঁশের, আর ছাদ ছিল খড়ের। এই ঘরে থাকত একটা নড়বড়ে মই, আর মরচে ধরা একটা নাঙল। কিছু দড়িদড়া থাকত। অন্যদিকে থাকত একটা বুড়ো বলদ যার কাঁধে একটা পাকাপোক্ত রকমের ঘা ছিল। ছ - বিঘা জমি চষত আসফাকের বাপ। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পরই আসফাক শুনতে পাচ্ছিল এবার নতুন আধিয়ার আসবে।'' (তদেব, পৃ. ৩১,৩২) তারপর একদিন সব হারালো সে। নিজেদের বাড়ী ঘরের সংগে সংশ্লেষ স্নেহ মমতার সমস্ত বন্ধন সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে। বাস্তুহীন আশ্রয়হীন আসফাকের সেই পথে সম্বল নামা। তীব্র ক্ষুধার পীড়নে অন্যের জমি থেকে শশা ফলমূল খেতে হয়েছে তাকে। যেতে যেতে বনের ধারে তাঁবু খাটানো একদল বেদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। সেখানে আবিষ্কার করলো তার চেয়ে ৬।৭ বছরের বড় কমরুনকে, সদ্য স্বামী [illegible] বিয়োগ হয়েছে তার। দলের

অন্য সবাই বসন্তের ভয়ে তাকে ফেলে পালিয়েছে। উন্মূলিত আর একটি জীবন। দুটি জীবনই তখন সব হারিয়ে বসে আছে। তারপর এলো সেই সন্ধিপূজার লগ্ন যেদিন নদীর জলে কমরুনকে স্নান করতে দেখলো সে। এ যেন পুরুষ আর প্রকৃতির দেখা। লেখক এই ঘটনার প্রায় বিরল চিত্রায়ন করেছেন ''...জন্মদরিদ্র আসফাক এই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরল রেখার মতো গাছের গুঁড়ি গুঁড়ি. তার এ কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। সেই নদী যেখানে সবুজ নীলে মেশান্, কখনো বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর।''(তদেব, ৬২) সব হারানো জীবনে এ আবিষ্কার সাত রাজার ধন। এক অদ্ভুত শক্তিশালী টানে তার জীবনে [illegible] জীবন যোগ করে আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছিলো সে। অধিকার প্রতিষ্ঠার জবরদস্তির পর তার বুকে ভয় জেগেছিলো ''কিন্তু তখন তার যে ভয় হয়েছিলো তা এই যে - সে কমরুনকে মেরে ফেলেনিতো ?'' (তদেব, ৬৩) আসামের উত্তর পূর্ব কোণ থেকে বেরিয়ে আসা বাউদিয়া দলের স্বামীহারা কমরুনেরও তখন চোখের মধ্যে হাসি। এভাবেই আশ্রয় খোঁজার পালা শুরু হয় দুজনার। বনমোরগ, তিতির, তাহুক, বক, মেটে আলু, টে, চ্যাং, পাটি, কুচলা পাতার সংগ্রহের চেষ্টায় দিন বয়ে চলে। মাস গড়িয়ে যায়। অথচ আশ্রয় নিশ্চিন্ত হয় না কোথাও। বর্তমান যুগে সমস্ত মালিকানা অন্য কারো হওয়ায় প্রেমিক প্রেমিকা তাদের শেকড় বসাতে পারে না কোথাও। উন্মুখ তবু আসফাক স্বপ্ন দেখে, কমরুণ নিজের সত্তায় তাকে প্রোথিত করে আশ্বাস দেয় বুঝি বা নিজেও আশ্বাস পেতে চায় ''আসফাক নিজের অযোগ্যতার এই তালিকা শুনে মলিনমুখে বনের দিকে চেয়ে বসেছিলো। কমরুণ শুকনো নরম

সবুজ ঘাসে শুয়ে একটু হেসে আসফাককে নিজের স্তনে টেনে নিয়েছিলো ।''(তদেব, ৬৬) শেষ পর্যন্ত অধিকারচ্যুত হতে হয় আসফাককে । কমরুন যদি হয় তার বাস্তু, তার নির্ভরতা, তাহলে সেই বাস্তু থেকে বিচ্যুত হতে হয় আসফাককে । জাফরুল্লা ব্যাপারীর অঞ্চলে ঢুকে পড়তে হয় আসফাক ও কমরুনকে । অন্য কোথাও চলে যাবার পথের প্রধান বাধাই হলো আসফাক সর্ব দিতে সক্ষম কিন্তু নিরাপত্তা দিতে নয় । তাকে নির্ভর করে কমরুনের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয় । জমির মালিকানা তৃতীয় পক্ষের হলে জীবনের রোমাঞ্চ কর্তিত হয়ে যায় ''হঠাৎ এক সন্ধ্যা থেকে কমরুণ আর এলো না । তারপর সেই দারুণ বর্ষায়, জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে । জাফরুল্লার চার নম্বরের বিবি । তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা ।''(তদেব, ৬৭) সেই কমরুন এখন অনেক জমির মালিক জাফরুল্লার চার নম্বরের বিবি । আর আসফাক জাফরুল্লার পেট ভাতায় রাখা চাকর । অথচ কমরুনের পেটে তখন আসফাকের সন্তান । কমরুন আসফাক সুন্দরের জগৎ থেকে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য হয়েছে খিদের জ্বালায় । সমাজের নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে । যে সমাজে সমস্ত বন, জমি সবকিছুর মালিকানা অন্য কারো হাতে সেখানে দেহরক্ষার তাগিদে চিরায়ত মূল্যবোধ শূণ্য হয়ে মানুষ দাসে পরিণত হতে বাধ্য । প্রেম, প্রেমিকা আত্মজ সমস্তই এক বলবান সমাজের কর্তৃত্বের মুঠোর ভেতরে আত্মসমর্পণ করে রিক্ত হয়ে পড়ে । ঘর খোঁজার চেষ্টা আবার উৎপাটিত হয়ে শূণ্যে দোলায়মান হয়ে যায় ।

জাফরুল্লা ব্যাপারী পৌরুষহীনা হলেও সমাজ তাকে ক্ষমতা থাকার জন্যে অধিকারের সীমানা ক্রমশ: বিস্তৃত করার সম্মতি দিয়েছে । এই ক্ষমতার কথাটা লেখক শুরুতেই পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন ''পাওয়ার শব্দটা আসফাক শিখেছে কিছুদিন আগে । ইংরাজী পাওয়ার শব্দটাই । আসফাক যতদূর পেরেছে উচ্চারণ করতে তার বেশী তার কাছে আশা

করা যায় না । আর কি আজব এই শব্দ । জাফরুল্লার চশমার পাওয়ার বদলানোর সেই গল্প কে না জানে । ছমির বলে পাওয়ার বদলাতে গঞ্জে গিয়েই জাফরুল্লা তিসরা বিবিকে দেখতে পেয়েছিলো ।জাফরুল্লা নাকি এতদিন বুঝতে পারেনি তার বড় আর মেজ বিবির বয়স হয়েছে । আবার দেখো, জাফরুল্লার সেই বন্দুকের পাওয়ার । সরু লাঠির মতো কালো চকচকে সেই নলটা থেকে যা বের হয় তা নাকি জমানো জমাট পাওয়ার, যার এক ফুলকিতে আকাশে ছোটা হরিণ নিথর হয়ে যায় । ম্যাজিস্টরদেরতো বটেই, এমনকি যারা ম্যাজিস্টর নয় অথচ তার মতো পোশাক পরে । পোষাকের কি বাহার দেখ ।'' (তদেব, ১২) এই পাওয়ার থাকার জন্যেই জাফর মোরগ যেমন করে মুরগী ধরে তেমনি বিবিদের বেছে বেছে সংগ্রহ করে । অথচ বীর্যহীন জাফর প্রাণান্ত চেষ্টাতেও তার একটি বিবিকেও গর্ভবতী করতে পারে না । বিবিদের কাছে যাবার জন্যে তাকে শহর থেকে ওষুধ এনে খেতে হয় । পুরুষ যখন তার সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার ভেতরকার অস্তিত্ব তুলোর মত পল্কা - স্থিতিহীন হয়ে পড়ে । মনের ভেতরে ভেতরে নিরাশ্রয় হয়ে সেও দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় খুঁজে ফেরে । এও একধরণের ঘরহীন ঘরে ফেরার পালা । তাই জাফর পাবতান কমরুনকে সাদি করে পেটের আসফাকের সন্তান মুন্নাফকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করে । আসফাককে বিভিন্ন কঠিন কাজ করতে না দেবার মধ্য দিয়ে বা জেলে যাবার সময় অথবা শহরে যাবার সময় গৃহের দেখাশুনোর দায়িত্ব দেবার মধ্যে আমরা এই প্রশ্রয়কে লক্ষ্য করি । জাফরুল্লার মধ্যে বনের আদিম শক্তি নেই, প্রাণকে সৃষ্টি করার সক্ষমতা নেই তাই তাকে ওষুধ খেতে হয়, যন্ত্রশক্তির সহায়তায় অধিকার বজায় রাখার চেষ্টা চালাতে হয় ।

আসফাক অন্য মুনিশদের মতো জাফরের বাড়ীতে থাকলেও মনের কোমলতাকে একেবারে মেরে ফেলতে পারে নি । প্রেমে উম্মাদ এব চরিত্র

সে। সুমেরীয়, মেসোপটেমিয় কিংবা সিন্ধু সভ্যতার উম্মাদনা যেন তার রক্তে। কখনো কখনো মনে হয় যেন সে এপিক অব গিলগামেশের পশুমানব এংকেদু। তবেও আকর্ষণেও আসফাকের মন বিন্দুমাত্র টলে নি। তাই বেআবরু মেজবিবি, রাতের পোশাকে শরীরের রং আর বাঁকগুলো স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া ছোটবিবি আসফাককে আকর্ষণ করতে পারে না। সেতো লম্পট নয়, সে যে উত্তীয়। তাইতো কমরুণের দরজায় গিয়ে তাকে বলতে হয় "কুমর, কি খুবসুরত তোক দেখায়।"(তদেব, ৭৮) অথচ চাপা গলায় যখন কমরুন বলে ওঠে "আমছিম, আজ রহইত থাকি যা। কিন্তুক মোর গাও ছুঁয়্যা কথা কর তুই আর আসবু না। - কমরুন কি কেঁদে ফেলবে এমন ভয় হল আসফাকের। কি ওঠানামা করছে ওর সেই স্তন দুটি।"(তদেব, ৭৯) তখনই আসফাক শান্ত হয়। সে বুঝতে পারে তার শেকড় আর কোনদিনই কমরুনের মাটিতে প্রোথিত হতে পারবে না। ক্ষমতার মারপ্যাচ তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে। ঘরে ফেরা তার কোনদিনই সম্ভব নয়। বুড়ো থেঁতে মাথা একবুক দাড়ি জাফরের কাছে সে সম্পূর্ণ পরাজিত। কমরুনের শিখিয়ে দেওয়া "ধলা মিঞা" নামে মুরুব্বি যে তাকে ডাকে - সম্মান দেয়, এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে। প্রতিবাদ জানাতে শহরে ওষুধ আনতে গিয়ে দেরী করে ফেরে সে, বনে ভুলুয়ায় ধরেছিল এমন গল্প ফাঁদে, প্রতিরোধ দাঁড় করাতে গিয়ে আসফাক হাকিমের কাছে নালিশ করে অথচ সে ভুলে যায় সভ্য সমাজে সার্বভৌম শক্তির সাথে বিচার - শাসন সমস্তই সংযুক্ত। এর ফল হিসেবে আত্মজের কাছ থেকে যে সামান্য সম্মানটুকু পেত আসফাক জাফর তাও কেড়ে নেয়। প্রেমতো আগেই গেছে এবার তার পিতৃত্বের সামান্য স্বীকৃতিটুকু উন্মূলিত হলো। বর্তমান সমাজ ব্যক্তির অন্তর্সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তীব্রভাবে। ব্যক্তির মনের মধ্যে অবদমিত হতে থাকে তার সমস্ত প্রবৃত্তি আশা আকাঙ্ক্ষা।`২

এই অবদমনই অরণ্যের রহস্যময় ক্ষেত্র । সেখানে মানুষ ফিরে যেতে চায় । অবচেতন মনের রহস্য, আদিমতার তাড়না যেন প্রতিফলিত হয় গাছপালা আর ভেজা নরম ঘাস জমিতে ''বনের মধ্যে অবস্থিত মহিষকুড়ার মত প্রাণগুলো যেন আমাদের অস্ফুট আবেগ''[৭] সেই আবেগের তাড়নায় আসফাক বারবার বনে যেতে চায় । সেই ভুলুয়া আবেগই মানুষকে উন্মাদ করে দেয় । সেই আবেগের আধিক্যে কেউ কেউ দেখে ফেলে রক্তচক্ষু মহিষের মাথার মতো প্রত্যুষের কোন জীব । আসফাক তাই বনের মধ্যে ঢুকলেই মোষের মতো হাঁটে, শিং দোলানোর মতো মাথা দোলায় আর মনে করে সে একটা মাদী মোষের পিঠে শুয়ে আছে, মোষের প্রিয় নটা ঘাসের গোড়া চুষে আস্বাদ পায় এবং হঠাৎই মাথা তুলে ডাকে ''ওঁ - আঁ - ড়'' । এ যেন তার অবদমনের বাস্তব প্রকাশ । উন্মূলিত জীবনের প্রতিষ্ঠা পাবার বাসনার ডাক । অথচ সভ্যতার আগ্রাসনে এই বাসনা পূর্ণাংগ রূপ পাবার সম্ভাবনা ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছে । যান্ত্রিক সভ্যতা আদিম সভ্যতাকে সরিয়ে এগিয়ে আসছে । ''...স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতাই আজ মানবসমাজের পরিচয় ।''[৮] আসফাক দেখে জাফরুল্লার সদ্য কেনা লেল্যাণ্ডের ট্রাক প্রকাণ্ড কালো মোষের মতো । এই কলের মোষের সাথে কোন মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না । পৃথিবীর সমস্ত দখলী জমির মালিকেরা কোন পোষ না মানা মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছেমতন চরতে দেবে না । শহর এগিয়ে এসে যতই গ্রাম তথা মানুষের স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করছে ততই মানুষের বুকের মধ্যে বন্য পশুর আলোড়ন, বনের দিকে মানুষ হাত বাড়ালেও তাকে কোন না কোন বাথানে ফিরতেই হবে । শুধুই শোনা যাবে ''ওঁ - আঁ - ড়'' যা কিনা তার প্রতিবাদের, সব হারিয়ে বসা জীবনকে আবার বসতিতে ফেরানোর প্রতিফলন ।

'উরুণ্ডী' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ডিসেম্বর, ১৯৮৬ সালে অমিয়ভূষণের 'শ্রেষ্ঠগল্প' নামক সংকলন গ্রন্থটিতে । গল্পটি পড়ে যে ধারণা দাঁড়ায় তা অনেকটা এইরকম - বহুদিন ধরে দলটি পথ চলছে । পুলিনের মুখে আমরা শুনি ''ফারাও ছিল মিশরের রাজা । তার অত্যাচার থেকে একদল লোক বেরিয়ে পড়েছিলো পিতৃভূমির খোঁজে । তাকে 'এক্সোডাস' বলা হয়ে থাকে ।''(শ্রেষ্ঠগল্প, পৃ.৭৭) ''হাঁস প্রথমে একটা ওড়ে তারপর আর একটা, তারপর দেখাদেখি আর সবগুলো ঝাঁক বেঁধে উঠে পড়ে ।''(তদেব, পৃ.৭৮) তেমনি বোধহয় জীবনেও ঘটে যায় । মসৃণ অস্তিত্বে দোলা লাগলে নৌকার তলাটা প্রথমে টালমাটাল দোলা খায় তারপর সমস্ত নৌকার কাঠামোতেই নড়াচড়া শুরু হয় । এক উজান পথে তার দাঁড় পড়তেই থাকে । এভাবেই অগ্রগমন চলে । বাহাত্তর জনের যে দলটা একদিন তাদের 'ওই পৃথিবী' থেকে 'জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে' পথ হাঁটা শুরু করেছিলো সে দলে লোকসংখ্যা এখন মাত্র বাইশ জন । বাধার রক্তচক্ষু, অত্যাচারের তাণ্ডব যন্ত্রণা, কিছুই তাদের পথরোধ করতে পারে নি । গোপীদের পরিবারটা রেলস্টেশনে বসে পড়েছিলো, ধরণচাঁদ আর বিমলির সাথে কয়েকজন পিছিয়ে পড়ে দলছাড়া হয়ে গেল, হিরণ আর যোগেন বিলটার ধারে মারা গিয়েছিলো, সরলা মাসীর মৃত্যু ঘটেছিলো । সরলা মাসীর মৃত্যুর পর ''এক হাঁটু জলের এক নদীর ধারে ভাঁটপার বনতুলসীর ঝোপের আড়ালে মুখে আগুন ছুঁইয়ে দলটা হাঁটতে শুরু করেছিল । সে আগুনে কতটুকু দাহ হলো কেউ জানে না । অবশ্য সারা পৃথিবীতেই তখন দাউদাউ করে আগুন জ্বলছিলো দুপুরের ।''(তদেব, ৭৮) তবুও তারা থামে নি । বহির্গমনে বেরিয়ে আশ্রয়হীনা থামা সম্ভব নয় । সেই আশ্রয় এলো চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের কালো পিচের পঞ্চাশ ফুট চওড়া রাস্তার বরাবর পাঁচ সাতশ গজ, সড়কের দুপাশে কোথাও তিনশ গজ, কোথাও দেড়শ গজ, অন্য কোথাও ষাট সত্তর গজ পর্যন্ত যে

জায়গাটার আয়তন - তার নাম উরুণ্ডী । ''জায়গাটা সমতল নয় পথের দুপাশে জমি কোথাও উঁচু কোথাও নিচু । উত্তর বরাবর সড়কের মাথায় মেঘ যেখানে জমে তার নীচে নীল নীল যা দেখা যায় তা নাকি পাহাড় আর পশ্চিমে মাঠগুলোর শেষে যেখানে মেঘ নেমেছে মনে হয় সেটা নাকি বন ফরেষ্ট ।''(তদেব, ৭৩) এই উরুণ্ডী যাকে কিনা ইদানিং শহর বলা যাচ্ছে তলে তলে সেখানে বাহান্ন জনের অবশিষ্ট বাইশ জন এসে নেমেছে । একটা নিশ্চিন্ত পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত হয়ে জোর করে আশ্রয় নেবার চেষ্টা । উরুণ্ডীর করাতকল, ধানকল, বাজার হাট, বেশ্যাপল্লী, মাথার উপরে আকাশ ধোঁয়া লোহার গম্বুজের মাথায় মাথায় হাইডাল প্রোজেক্টের তার যা থেকে বিদ্যুত নামবে প্রমাণ করে উরুণ্ডী x শহর হতে যাচ্ছে । এখানেই অবশিষ্ট দলটি এসে ঠেকেছে কয়েকমাস । বাইশ জনের দল । কয়েকমাস হয়ে গেল তাদের ঘরগুলোর বয়স । দলের দুজন শিশুর একজন নরেশের ছেলে নিতাই প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে । ঠিক যেন গৃহস্থের রোদ ভরা মাটে 'কলার পোয়া' লাগানোর মতো । একজন অন্তত: এই মাটিতে শেকড় ছেড়েছে বা ছাড়ার জন্য চেষ্টা করছে । গজু, ভাসান, সুরেন, নেত্য, পোড়াকে নিরাশার এক জান্তব ভয় তাড়া করে ফেরে ''কালো, কয়লায় আঁচ দিলে যে রকম ধোঁয়া তেমন কালো, আর তার মধ্যে তেমন নানা জন্তুর আকৃতি । সে শুধু ভয়ের কথাই বলে, অন্তত আতঙ্কের উপরে জোর দেয় । ...... আর সেই কালো জন্তুগুলো তাড়া করছে, যাকে ভালো করে দেখা যায় না, চেনা যায় না .... আবাম্‌, মবান । তারা ভয়ে মবান ।'' (তদেব, ৭৬) চলতে চলতে যদি মাথার ওপর একটু নিশ্চিন্ত আকাশ দেখা যায়, একটু আশ্বাসের বাতাস বয়, সামান্য ছাউনির আশ্রয় সান্ত্বনা দেয়, তখনই মানুষের শরীর ভার হয়ে আসে । যেমনটা এখন এই দলটার । তাই আগামী ইলেকশনের সুযোগে তারা

ছোটবাবুদের কাছে প্রার্থনা জানায় খান তিনেক তাঁদের দখলি জমির মুক্ত ঠিক করে দেবার। অথচ লোভী আর ক্ষমতাবান মানুষের হাতে পড়ে এই নতুন আশ্রয়ও হয়তবা দাঁড়িয়ে যাবে আর এক প্রবঞ্চনায়। তাইতো করাত কলের কাছে যে নতুন ধানকল তার মালিক ব্রজ চক্কোত্তি। যে ব্রজ চক্কোত্তি বিপিনের পাশের গাঁয়ের মানুষ - দশ নম্বর গ্রাম ছাড়া। এই আবিষ্কারের অবস্থায় সরল মানুষ স্তম্ভিত হয়। সম্পদ ও ক্ষমতার কাছে ঘেরে যাওয়া মানুষ বোকাতে পরিণত হয়"... ভাসানও একটু পিছিয়ে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে। আলোর কালিটা তার হাঁ করা মুখের দাঁতগুলোর উপরে পড়লো। কি কদর্য হাঁ করা মজুরের মানুষের বোকা বোকা মুখ।" (তদেব, ১০) কিন্তু সবাইকে ফাঁদে আটকানো যায় না যেমন সরলা মাসির ভায়ের ছেলে পুলিন। কিছুতেই মেনে নেবে না এইরকম একটা ভাব আছে পুলিনের। এই দুর্বার বহির্গমনকে ঠেকাতেই বুঝিবা এক আশ্রমের শরীর নিয়ে সম্পর্কে পুলিনের দূরসম্পর্কের মামী তেলের অভাবে রুক্ষচুল আর উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী বিধবা শোভা মাথার নীচে দুহাত জড়ো করে ঘাসের উপরে শুয়ে পুলিনের মনটাকে এলোমেলো করে দেয়। অথচ যে হাঁস উড়বেই তাকে তুমি ঠেকাবে কি করে? তাইতো পুলিনকে আটকানো যায় না। যাবার সময় সে শোভার শরীরে অস্তিত্বের মতো দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে যায় এই সর্বনাশা নেশা। যা শুধু ধাবিত হয় আশ্রয়ের বিশাল সমুদ্রের দিকে। তাই শোভার এখনও পথের অভ্যাস যায় নি, খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট নেই, যখন তখন স্নান করার কথা মনে হয় "পথ চলায় রসটাই স্বাভাবিক ছিল কিংবা সেটাই স্নানের একমাত্র উপায়। পুকুর, কুয়ো, কল মানুষ নিজের প্রয়োজনে তৈরী করে, কাজেই চোখ চোখ করে রাখে। বাকী থাকে নদী। আর নদী তোমার পথে নির্দিষ্ট একটা সময়ে রোজ দেখা দেবে আশা ঘোর পাগলেও দুএকবারই করতে পারে।

কাজেই নদী পেলেই চান । তার আর সময় অসময় কি ?''(তদেব, পৃ.৮০)

উরুণ্ডীর ভারী প্রবন্ধ না পোড়ার মনে চলার নেশার মাতন লাগায় । বয়সে সামান্য ছোট পুলিন তার কাছে আদর্শ । কিছুতেই হার মানবো না এমন [illegible] হাঁস পুলিন । তাই করাত কলের দিক থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের মিথ্যে আশ্বাস নিয়ে অন্ধকারে দুচারজনলোক যখন খুশীতে হাসাহাসি করতে করতে ফিরছিল তখনই রক্তে জেগে উঠলো সেই অনুভব - সেই বোধ যা আমাদের সচল করে তোলে দুঃখিত আশ্রয় ছেড়ে নতুন আকাশের নীচে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার জন্য । ''অন্ধকারে কি বোঝা যাচ্ছে এখন সড়কের উত্তর মাথায় নীল নীল পাহাড়ের আভাস । আরে বাপু, অন্ধকারে তুমি দেখছো না বলেই কি পাহাড়গুলো লোপ পায় ।''(তদেব, পৃ.৯০)

১৩৯২ সালে 'বিনদিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিলো । ঐই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু চল্লিশুড়ি নামে একটি গ্রাম যার অবস্থান উত্তরবঙ্গ আসামের সীমান্তের দিকে পাহাড়ী এলাকার মরা রায়ডাক বুড়ি রায়ডাক নদীর পাড় ছুঁয়ে । গ্রামের দুটো অংশ - অন্দরম চল্লিশুড়ি আর বাহির চল্লিশুড়ি । মরা রায়ডাকের কোল ঘেঁষে থাকা চল্লিশুড়ি গ্রামে প্রবেশ করতে গেলেই চোখে পড়ে হাতিজল্পী জোড়া নামে দুটি সুবিশাল গাছ । 'গুড়ি' শব্দটি গাছের গুড়ি থেকে আসে নি, ধারণা, 'গোড়া' শব্দটি বোডো জাতির ভাষার শব্দ । ঐতিহাসিকরা অনেকে মনে করেন যে এই অঞ্চলে কোন সময়ে বোডো জাতির লোকদের বসবাস ছিল । গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম জন কেইব যার নাকি আসল নাম জনাদন কিংবা জনাথন ''রাভা ভাষায় ত বর্ণ আর ট বর্ণ আলাদা নেই, যেমন বাঙালী আর রাজবংশী ভাষায় । রাভাদের আবার অহোমদের থেকে পৃথক করা যায়, রাভা ভাষায় 'স' সবসময়েই 'স' থাকে । অহোমী শব্দের প্রথমের 'স' কে 'হ' আর শেষের 'স'কে 'চ' বলে । যে রাভা তার নামে 'থ'

আর 'দ' থাকে না। জন ভাল, জনাই ভাল।''(বিরন্দিনী, পৃ.৭৮) আঞ্চলিক পরিবর্তনের ছোঁয়ায় ধর্মান্তরিত হয়ে সে খ্রীস্টান হয়েছে। তল্লিপুড়ি গ্রাম থেকে অনেকদূরে রেভারেণ্ড রোপার্ট স্ট্যাডস্পেন্টারের গোপালগঞ্জের ব্যাপটিস্ট মিশন হাউসে থাকতো সে। পিতনরঙা বেশ লম্বা একহারা শরীর, নাকটা কিছুটা চওড়া, কালোচুলে কপাল ঢাকা। মিশন হাউসে তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার পরিমণ্ডলে থেকে নিজস্ব রাভা সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। অথচ বিদেশীরা গবেষণার নামে আদিবাসী এই জাতির লোকদের নিজস্ব ভূমির দাবীর কথা - আন্দোলনের কথা চোখে আঙুল দিয়ে বারেবারে দেখিয়ে দেয় ''আর তারপর জোন ম্যাডাম সেই সুন্দর কথাগুলো বলেছিল। ভাষা কি করে একটা জাতির বাসস্থান, আবহাওয়া, নদনদী, পাহাড়, বন, আকাশ, পর্যবেক্ষণ, সামাজিক আচার, রুচি, অরুচি, সমাজের মানুষগুলোর পরস্পর সম্বন্ধ ধরে রাখে ভাবলে অবাক হতে হয়। চিন্তার নিজের চেহারা নেই, চেহারা দিতে গেলে জাতির চারপাশের ওইগুলি থেকে ছবি তুলে আনা হয়। সুতরাং ভাষা শুধু চিন্তাকে ধরে রাখে না, জাতির ব্যক্তিত্ব আর কোথায় সে ব্যক্তিত্বের অবস্থান তাও ধরে রাখে। বলা যায় একটা জাতির মৃত্যু ও একটা ভাষার মৃত্যু প্রায় একই কথা। ---- ... মনে রাখতে হবে রাভা ভাষা ও রাভা জাতির বাঁচার আন্দোলন এটোই।''(তদেব, ৭৮) ''রাজার ভাষাই ভাষা, রাজা বদলালে ভাষা বদলাবে। আগের ভাষা তখন মরে যায়, সে আর বাঁচে না। কিংবা কোন জাতের যদি রাজ্য না থাকে ভাষাও থাকে না।''(তদেব, ৮১) ''সেই রাতেই অনেক গল্প হয়েছিলো। সেদিনই সে শুনেছিল নিজেদের রাজ্য না হলে ভাষা রাখে না। আর সেই সংকিতি না কি যেন। ম্যাডাম বলেছিল, সংকিতি না বোঝ জেনে নিতে পারো ভাষা আর ওটা একই। মোট কথা, অহোমরা যেমন মেইতেইরা যেমন, তেমন তোমাদেরও একটা আন্দোলন করতে হবে

হয়তো ।''(তদেব, ৮১) বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্মের পটভূমিকা সবজায়গায় বুঝিবা অনেকটা এইরকম । যে কোন জাতি বা উপজাতির ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যদি আমরা ভূখণ্ড দাবী করি তবে এক অগ্নিগর্ভ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে । রাজা - কোচরা মনে করে তাদের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হয়েছে হিন্দুধর্মের ছোঁয়া লাগার জন্য । কোচবিহারের মহারাজারাই নাকি এর জন্য দায়ী । রাজা-কোচদের মর্মে মর্মে ধ্বনিত হয় এক দুঃখ, সে দুঃখ হলো হিন্দুত্ব তাদের জাতিসত্তাকে ধ্বংস করেছে । রক্তের ভেতরকার এই সংকট জন্ম দিয়েছে এক অসহায় সংস্কৃতিহীন বেদনার যার জন্য শুরু হয় পিতৃপুরুষের অস্তিত্বের সংস্কারের খোঁজ যার অন্য নাম সভ্যতার ভাষায় সংস্কৃতি বা কৃষ্টি । নিজের আদি জমিতে বসবাস সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই জনগোষ্ঠী যেন হয়ে গিয়েছে উদ্বাস্তু । জন কেইব ধর্মান্তরিত হয়ে স্ট্যাডেম্যান্টারের মিশন হাউসে ৫ বছর থাকলেও ভেতরে ভেতরে তার রাজাকোচসত্তা জাগরিত ছিল । তার সেই হারানো সত্তাকে সে সবসময়ে খুঁজে পেতে উৎসুক । তুষের আগুনের মত সে দাহ অন্তরে ধিকিধিকি প্রজ্বলিত হয় । রাজা কোচদের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ধারণাটি পরিষ্কার থাকলে এই উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে । আমাদের বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডঃ ভুবনমোহন দাসের বক্তব্য হলো ''রাজাগণ মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, তাদের মধ্যে অস্ট্রিক শ্রেণীর রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে ।''[৯] গ্রায়ার্সন বলেছেন ''কোচগণকে ডাল্টন ও রিজলে প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিকগণ ভারতের কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসী বলে যে মন্তব্য করেছেন, তা ঠিক নয়, তারা নিশ্চিতভাবে চীনা-তিব্বতীয় যদিও তাদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে ।''[১০] বি.এইচ. হাডসন কোচ ও রাজাদের এক বৃহত্তর বড়ো পরিবারভুক্ত বলে মনে করেন । শ্রীঅমলকুমার দাস ও মনীষকুমার রাহার মতে পশ্চিমবঙ্গের রাজারা কোচ শ্রেণীভুক্ত যারা কিনা রাভাদের একটি শাখা । ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কোচদের চীনা-তিব্বতীয়, বড়ো গোষ্ঠীভুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন ।[১১] এসব আলোচনা বিস্তারিত পড়ে আমরা

জানতে পারি যে রাভারা চীনা তিব্বতীয় বংশ থেকে এসেছে এবং বৃহত্তর বড়ো(Bodo) গোষ্ঠীর শাখা । এরা দক্ষিণ চীন ও ব্রহ্মদেশ দিয়ে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নোয়া দিহং নদীর পথ অনুসরণ করে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রবেশ করে । চীন ও ব্রহ্মদেশ-এ তখন অস্ট্রিক(Auctro-Ariatic) ভাষাভাষীরা বাস করতেন । উভয়দলের যে সংঘর্ষ হয়েছিলো তাতে রাভাকোচদের পূর্বপুরুষেরা পরাজিত হন, কৃষ্ণবর্ণ অস্ট্রিক পুরুষেরা পীতবর্ণা মহিলাদের অধিকার করেন, এভাবেই অস্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রন হয় । তবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য বিজিতা হয়েও মহিলারা পুরুষদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেন । তাই এদের ওপর অস্ট্রিকভাষার কোন প্রভাব নেই । এভাবেই প্রথম রাভাকোচদের পূর্বপুরুষদের তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে কিছুটা ছিন্নমূল হতে হয়েছিল । উত্তরবঙ্গে তারা বসতি বিস্তার করেন ও কোচবিহারের মহারাজ বিশ্বসিংহের সময়ে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন । এভাবে সংস্কৃতির দিক থেকে তারা দ্বিতীয়বার শেকড় থেকে উৎপাটিত হন ।

রাভাদের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ঋষিবায় বা রাংকারাং স্বর্গে বাস করেন এবং তার নির্দেশে তাকমান্ত্রা পৃথিবী পরিচালনা করেন । ঋষিবায়ের স্ত্রীর নাম রৌশুক । ঋষিবায় কোচেন্দ্র, মেচেন্দ্র, লিপচু ও লিম্বু নামে চার ধরণের মানুষ তৈরী করেছেন । রাভাদের সমাজে হৌসুক বা বারায় বা গোত্রের প্রচলন কঠোরভাবে রয়েছে । মাতৃতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী মায়ের গোত্রে ছেলেমেয়েদের পরিচয় । একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ, বিশেষ কোন খাবার খাওয়া বা কাজ করাও নিষেধ । 'চিকাবাইরাই' হলো আত্মার সদ্গতির চাবিকাঠি । এরা বিশ্বাস করেন যে মারা গেলে আত্মা পঞ্চভূতে মিশে যায় । কিন্তু নতুন সৃষ্টির সময়ে আত্মা কোন দ্রব্য বা শক্তিকে যেমন নদী, পাহাড়, গাছপালা, কীটকে আশ্রয় করে মাতৃজঠরে প্রবেশ করে ও সেই

বস্তুকেই অবলম্বন করে মৃত্যুর পর পরমাত্মায় মিশে যায়। মরার সময় তাই কানে কানে সেই বস্তুটির নাম বলে দিতে হয়। নাহলে মুক্তি হয় না। এটি হলো 'চিকাবাহিরাই'। এটি খুব গোপনীয়, শুধু রাভা রমনীরাই এর খবর জানেনা, তাছাড়া রাভা কোচদির মধ্যে 'ক্লাংনানি' বলে একটি অপ্রচলিত প্রথা রয়েছে। প্রথা অনুযায়ী বিপত্নীক মেয়ে জামাই বিধবা শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করতে পারে। কোচ রাভাদের আদিম কৌম সত্তার আশ্রয়স্থলই হলো একখন্ড জমি আর একটি নারী।

জন কেইব মিশনে থাকতে থাকতে বিদেশী মিশনারীদের উত্তেজক বিশ্লেষণে একদিন অনুভব করলো তার ভেতরকার সেই আদিম রাভা সত্তার যা কিনা আজ গৃহহীন - পরবাসী। ইতিমধ্যে সে বিয়ে করেছিলো বিন্দেকে। তের বছরের বিন্দে মা হতে গিয়ে উজ্জ্বল কাঁথার সাথে মিশে গিয়েছিলো। অস্ট্রিকদের হাতে পরাজিত হয়ে প্রথমবার রাভা সত্তার বিসর্জনের ওপর আঘাত হেনেছিলো কোচ রাজাদের চাপিয়ে দেওয়া হিন্দুত্ব। এর ওপরে মিশনারীদের চাপিয়ে দেওয়া খ্রীস্টধর্ম উন্নতির বদলে তাদের নিয়ে যাচ্ছিলো আদিম সংস্কৃতিহীনা আর এক আধুনিক শূন্যতায়। মিশন হাউসে মিথ্যে চোর অপবাদ পেয়ে জন কেইব পালিয়ে ফিরে যেতে চাইলো তার রক্ত মজ্জায় মিশে থাকা কৌম সংস্কৃতির কাছাকাছি - তল্লিগুড়ি গ্রামে। সেখানে বিন্দে'র মা বিন্দনী থাকে। যদিও 'রিন্টবেঙ্গনের' লোকেরা তাদের অঞ্চলে বেশী করে থাকতে আরম্ভ করে তাদের দৈনন্দিন আচার অভ্যাস পাল্টে দিচ্ছিলো। এদিকে বিন্দনীও তখন আর আদিম রাভা হয়ে নেই। তাইতো সে নবদ্বীপ তীর্থ করতে যেতে চায় যার সাথে আদিম রাভা কৌম জীবনের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। 'মাওরিয়া বেটা'। জনাদনকে বিন্দনী সাগ্রহে গ্রহণ করে। প্রাথমিক শিক্ষিকা বিন্দনী। বিন্দনীর বেশ খানিকটা ধানী জমি বর্গা হয়ে গেলে নতুন বর্গাদার বোড় মহান্ত'র দিকে তার নারী সত্তা হেলে পড়ে। আসলে রাভা মেয়েরা ধানের জমি রাখতে

এমন সাহস দেখাতে পারে হয় যা অন্যকোন জাতির মেয়েরা ভাবতেও পারে না। সহ্য করতে পারে না জনাদন। এভাবে রাভাদের জমি বর্গা আইনে অন্যের দখলে চলে যাবে এ অসহ্য। সংস্কৃতির সাথে সাথে শেষ জমির আশ্রয়টুকু চলে যাবার অর্থ ভেতরে বাইরে দু দিকেই আশ্রয় হারানো। প্রচলিত আইন তাকে কোন সাহায্য করতে পারে না। শক্তিমানদের - শাসকদের আইন ও শক্তি, মানুষের 'ইচ্ছা' কেন জানি না বারেবারেই মানুষকে ছিন্নমূল করে দেয়। জনাদন উন্মাদ হয়ে ওঠে। যেভাবেই হোক জমি আর নারীর অধিকার নিতেই হবে। দুদিক থেকেই রিক্ত হয়ে যাওয়া মর্মান্তিক। শ্বাশুড়ী বিনদনীর আবেদন তার কাছে বদলে যায় - ''সে নিজেকে বললো, দেখো উম্রার শাড়ি থাকি জল পড়ি খোড়ালির কাছে মাটি ভিজি খোড়ালিং লাগে। মাথাং ঘোমটা। কিন্তু চুল পিঠং নামি আছে। চুল ভিজা। জল পড়ি পড়ি ফির শাড়ি ভিজায়। চুল কালা। শাড়ি সাদা কি নীল, কি নীল কি সাদা। তা থাকি পিতল রং। দেখো, এভাবে সব চোখে পড়ে। চোখে এক রং ছেড়ে অন্য রংয়ের তফাৎ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠাতে সে নিজের উপরে খুশী হল।'' (বিনদনি, পৃ.৮৫) 'কিলাংনানি' প্রথা অপ্রচলিত হলেও তাকে আশ্রয় করেই সে বাঁচতে চায়। ফিরে যেতে চায় সেই আদিম কৌম সত্তায় যেখানে নারী আর জমিতে থাকবে নিজস্ব সংস্কৃতির অধিকার। ঘরহারা মানুষ এভাবেই অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। তাই একদিন রাতে জনাদন প্রবেশ করলো বিনদনীর ঘরে ''সে দেখল বিনদনী দাঁড়িয়ে পড়েছে। জনাদন দরজাটা বন্ধ করে দিল। সে বিছানার দিকে দু একপা এগিয়ে গেল। বলল, তো, শোনেন, আজ থাকি আমি শোং তোমার ঘরং। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারা যাচ্ছে না। বুকের ভিতরে ধক্‌ধক্ করে যাচ্ছে। বাইরে পৃথিবীতে কি হচ্ছে কে জানে? শীতেও যেন জনাদন ঘেমে উঠছে গরমে। বিনদনীর মুখ ফ্যাকাসে, কখনও সে মুখে রক্তের চাপ আসছে। তার হাত পা কাঁপছে বসে সে বিছানায় বসে পড়ল। দরজায় পিঠ রেখে

দাঁড়ান জনুকে আর সে ছেলেমানুষ ভাবতে পারছে না। জনাদন কথার দরকার অনুভব করলো। তার গোটা শরীরটা ঝিমঝিম করছে। সে ঝিম বিছানার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, বসি ?''(তদেব, ১৪) আদিম সংস্কৃতি থেকে সরে আসা প্রাথমিক শিক্ষিকা বিনদনির কৌম সত্তার কাছে সে আবেদন যতই অপ্রত্যাশিত হোক না কেন তাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই জনাদনকে সে জোর করে ঘর থেকে বের করে দেয় নি ''তার মনে পড়ল কিছুক্ষণ আগেই বিনদনি তাকে বলেছিল আচ্ছা, দেখ, রাত কাটি যায়। জোর বৃষ্টি নামে বা। যাও তোমার বিছানং যায়া ঘুমাও। তার মনে পড়ল, বসে থাকতে থাকতে বিনদনি বলেছিল, আচ্ছা, তো, আইজ রাওখান ভাবি দেখং।''(তদেব, ১৪) এরপর আদিম সত্তায় উজ্জীবিত জনাদন পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী ও বর্গাদারকে ধান কাটার সময় হত্যা করে। জমি আর নারী তার হাত থেকে চলে যাবে একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না সে। কিন্তু সবাই টের পেয়ে যায় যে এটা তারই কাজ। ধরা পড়ার ভয়ে অস্থির জনাদন বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ফিরে আসে বিনদনির কাছে, ফিরে যেতে চায় - আশ্রয় পেতে চায় জঙ্গলে ''চল, পালাং চল। তোমরা থাইকলে সবে নাকি যাইবে। সে বিনদনির হাঁটুতে মুখ রাখল, আচ্ছা, আচ্ছা, না - হয়ত আমার যাও হব। যাও হয়া বনং চলেন।''(তদেব, ১৬) কিন্তু আধুনিকতার কাছে ব্যর্থ সে আবেদন। এখন আর ফেরা যায় না। পুলিশ ঘিরে [illegible] ফেলে তাকে। গুলিতে ঘুরে পড়ে গেলে ''আর ঠিক তখনই সিঁড়ির ঝোপ গোড়া থেকে আর একটা টর্চ জ্বলে উঠল। কেউ চিৎকার করল যরাহুস হ্যানডস আপ। জনাদন ঠিক করল সে একতলার গোয়ালের খড়ের গাদায় ঢুকে যেতে পারে। সে সেদিকে দৌড়াতে গেলেই সেখান থেকেও আর একটা তীব্র আলোর ঝলক দেখা দিল। শব্দটা শুনবার আগেই সে পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল''(তদেব, ১৬) অস্ট্রিকদের হাতে, হিন্দুদের হাতে যে রাজাকোচদের সংস্কৃতি নিজস্ব আশ্রয় থেকে সরে যেতে বাধ্য

হয়েছিল আধুনিক বর্গা আইন, পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এবং শাসনযন্ত্র তার শেষ ঘন্টার আয়োজন করে তুলেছে অনিবার্যভাবে ।একদল উদ্বাস্তু আর জনগোষ্ঠীকে উদ্বাস্তু করেছে - ভাগ্যের এ এক পরিহাস । যদিও কোথাও কোথাও এর বিরুদ্ধে দ্রোহ জাগছে, সেই দ্রোহের একটি করুণ অসফল পরিণতি লেখক আমাদের দেখিয়েছেন । ব্যর্থ হলেও এই দ্রোহের প্রয়াস ঘরহারা, সংস্কৃতিহারা মানুষের জীবনের মূল্যবান অয়স্কান্ত মণি ।

'অ্যাভলনের সরাই' গল্পে দেখা যায় যুদ্ধ মানুষকে অসহায় করে তোলে । কিছু লোভী মানুষের লালসার বলি হয় অজস্র সাধারণ মানুষ। ''যুদ্ধ যেন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প । তার ফলে ভদ্রতার আবরণ, নীতির রক্ষাকবচ, পারিবারিক মান সম্ভ্রম মায়া মমতা আনুগত্য যুগ-যুগান্তরের ধর্ম সংস্কার - সবই এই ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়েছে ।''[১২] ''যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আদিমতার বীভৎস - হিংস্র প্রবাহ উদ্বেলিত হয় - তাতে মানুষের সভ্যতা, কল্যাণ বুদ্ধি ও সৌন্দর্যচেতনা সম্বন্ধে সমস্ত বিশ্বাস টলে যেতে চায় ।''[১৩] যুদ্ধের সময় ইউরোপে ঘর হারিয়ে যেসব মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিল তারা অনেকেই লোনা ঘামের নিষ্ঠায় ইউরোপের এখানে ওখানে কাটি খুঁজে পেতে চেয়েছিল যদিও তাদের মনটা পুরানো লোহা লক্কড়ের দোকানের সামনে ডাঁই করে রাখা জাংকের মতো কারন মানুষ কখনো অতীতকে ভুলে যেতে পারে না । কিন্তু যুদ্ধের সময় যে সব মানুষ স্থান পরিবর্তন না করে অচঞ্চল চিত্তে অবস্থান করেছিলেন তাদের ভেতরেও কখনো কখনো কি যেন এক বোধ খেলা করে ওঠে । অস্থির উন্মনা মানুষ হ্যাভারস্যাককে সামান্য কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে জীবন মৃত্যুর ঝুঁকির মাঝে সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে যেতে চায় অন্য কোনখানে যেখানে থাকবে এক বুক ভালোবাসার আশ্রয়, নিশ্চিন্ত স্থির বিশ্রাম নেবার এক অলৌকিক ঘর পোরস্থানী, স্বপ্নে কিংবা দৃঢ়বিশ্বাসে যার নাম অ্যাভলনের সরাই ।

এরকম একদল মানুষ যারা "মু'' শহরে এসে পৌঁছেছিল । পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের দল । দলে এমন কেউ ছি না যাদের সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীদের দু'একজন সীমান্ত পার হতে গিয়ে ব্যর্থ হয়নি । সেন্ট সাইমন, নিরুচকা, যোসেফ, রুথ, জন, পাপা, মিশা, ড্যান, ব্রুন ফ্লিন্ট, বুড়ো আইজ্যাক, ফেরেন্স, সিমার, আরো এমনি অনেককে নিয়ে এই দল । সবার চোখে এক স্বপ্ন - কষ্টের পাহাড়টা অতিক্রম করলেই দেখা যাবে এক ভালোবাসার স্থায়ী দুর্গ অ্যাডলনের সবাই ।

ধ মাথার পেছনে সরচে আর সাদায় মেশানো খাঁপা চুল নিয়ে প্রাচীন অধ্যাপক যোসেফ স্ত্রী রুথের সাথে পথ হাঁটছেন । তাদের একমাত্র ছেলে সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে একগুলি সাব মেশিনগানের গুলিতে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল । তাই তার প্রাচীন কৌলিকতাকে জীবিত রাখতে পারার আর কোন সম্ভাবনাই নেই । তার লেখা বইগুলোতে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্ত আছে তা সবই যেন বন্ধ্যা প্রমাণিত । মূল উৎপাটিত হলে ঐতিহ্যের সারবত্তা বজায় থাকা সম্ভব নয় । রুথের মন মাঝে মাঝেই চলে যাচ্ছে বহু বছর আগেকার এক পরিবেশে যেখানে তাদের ছেলে জন্মেছিলো তাদের হাসি নিয়ে । ছেলের হাসি ছেলেকেই মনে করিয়ে দেয় । তখনই মনে ভয় আসে । কিন্তু ভয় পেলে চলবে না, অ্যাডলনের সবাই কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আছে, সেখানে পৌঁছাতে পারলেই ওরা আসবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে । তাইতো চোখের জলের নোনা স্বাদ জিভে রেখে পথ হাঁটা ।

জন তার নিজের শহরে রাজমিস্ত্রী ছিল । আজ সাথে করে কিছু আনতে না পারলেও সে যোসেফের চাইতে ভাগ্যবান কারণ স্ত্রীর সাথে মেয়ে পাপা আর মিশাকে সে আনতে সমর্থ হয়েছে । পাপার পায়ে ফোসকা পড়ায় একটা পুরানো অমনিবাসে চড়ে যাচ্ছিল পনেরো যাবার সময়ে একজন বিদেশী যাত্রী দুর্বোধ্য ভাষায় গান করতে করতে পাপার উরুতে চাপড় মারলে জন বুঝতে পেরেছিলো যে মানুষ শেকড় হারালে প্রতিবাদ করার মতন মনুষ্যত্বটাও অনেক সময় হারিয়ে ফেলে । তার মন থেকে উঠে

আশা একটা ভয়ংকর কালো হিংস্র অসম্ভব অসহায় কিছু তার হৃদপিণ্ড কামড়ে ধরেছিল। স্ত্রীর পরিচর্যা পাওয়া ছাড়া ওদের আর কিছুই করার ছিল না। অথচ কিশোরী মিশাকে বারোয়ারী স্নানের ঘরে স্নান করতে দেখেই বোঝা গিয়েছিলো ওর মাঝে নতুন কেউ আসছে। সম্ভবত: যে এর স্থপতি সে হয়ত সীমান্তের ওপারে থেকে গিয়েছে। মিশা একাই বয়ে নিয়ে আসছে পুরানো বীজ যা থেকে নতুন চারাগাছ হতে পারে। এই নতুন প্রজন্মই হয়তোবা নতুন করে ঘর বসত পাবে। সবাইতো পারে না এভাবে নতুন হয়ে উঠতে। যারা পারে তারা কিশোরী মিশার মত ভাগ্যবতী। দিনের উত্তাপ ক্রম যতই বাড়তে লাগলো। পথ ততই গোলক ধাঁধা হতে লাগল। তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে উদ্ভ্রান্ত দলের সাথে মিশা যতই হাঁপাতে লাগলো ততই যেন কংসের কারাগারে কৃষ্ণের আবির্ভাবের মতন তার আগামী পদক্ষেপ ধ্বনি ধ্বনিত হতে চলেছে।

নিনা - যার ভালো নাম নিরূপমা সেও চেয়েছিলো মিশার মত ভাগ্যবতী হতে, চেয়েছিলো মায়ের মতো গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ তার শরীরটা প্রাণের অপব্যয়ের হেতু না হয়ে প্রাণ হবে, স্নেহ হবে। কিন্তু তা হয় নি। ধর্ষিতা নারীর সব ধন নষ্ট হয়ে গিয়ে যেমন ভবিষ্যৎ মুছে যায় তেমনি তার জীবন। আগেকার জীবনে সে ছিল পেশাদার দেহ পসারিনী। নিনার বেশীর ভাগ খদ্দের ছিলো ছাত্র যারা নিনা মায়ের মতো গাম্ভীর্য দেখে অন্যদের বাদ দিয়ে তার কাছেই বেশী করে আসতো। ইডিপাস কমপ্লেক্সের খদ্দের নিনার ভালো লাগতো না এমন নয় অথচ তা সত্ত্বেও তার একটা নিজস্ব কামনা ছিলো যা কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে নি। তাই মিশার মধ্যে এই পূর্ণতাকে দেখে সে স্বপ্নের ঘোরে আবিষ্ট হয়। অথচ তার জীবনটা অন্য খাতে বয়ে গেল। শরীরে মনে বসত করা আর কখনো হলো না। সীমান্ত পেরিয়ে যখন সে অন্য আরম এক রকম উদ্ভ্রান্ত, তখনও দেখা গেল বিদেশী ট্রাক ড্রাইভারের নোংরা ঘরে ঘরে দ্বিধাগ্রস্ত অকৌশলী আচরণগুলো তার শরীরে ঝিমঝিম করে। সবার জীবনে একটা করে পবিত্র দিন থাকে - নিনার জীবনেও সাতাশে নভেম্বর, তার মায়ের মৃত্যুদিন। অথচ ট্রাকে চেপে কিছুটা পথ পাড়ি

দেবার জন্য তাকে ড্রাইভারের সাথে এই দিনই অন্যায় সংসর্গে লিপ্ত হতে হয়। সব হারানো জীবনে সুতোর বাঁধনের টান বারেবারে আলগা হয়ে যায়। সেন্ট সাইমনের মাথায় ক্যানভাসের হ্যাট, গায়ে সাদা ময়লা মেটে রং'এর পা পর্যন্ত লম্বা ঝুলের স্মক্ ফ্রক দেখে যখন তাকে পাদরীর মতো মনে হয় তখন নিনা তার সাথে দলে ফিরে আসে। মাঝে মাঝে পথ চলার একঘেঁয়েমি যখন মনে সন্দেহের জন্ম দেয় তখন নিনা যোসেফকে আশার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রুথের অকারণ অ দংশনে সে খেপে ওঠে। তাছাড়া নিনার বাদামী সাদায় মেশানো চুলে, খয়েরী চেক সুতোর গাউনে এমন একটা সুস্থ পশুর ভাব আছে, যা থেকে ওর শরীরটার কথাই মনে হয়। আসলে প্রবঞ্চনা থেকেই জ্বালার জন্ম। যে মানুষগুলোর জীবনে সবকিছু ছিল হঠাৎ যদি একদিনেই তা নিরর্থক হয়ে ওঠে, শূন্য হয়ে ওঠে, তবে বুকের মধ্যে কষ্টের ঢল নামবেই। মানুষগুলো যেন বঞ্চনার জ্বালায় একে অন্যকে দংশন করতে চায়। তাই সেই রাতেই নিনা নিজের হাতে পুতুল ভাঙার মত প্রমাণ করেছে সেন্ট সাইমন তার অন্য অনেক ক্রেতার মতই একটা সাধারণ উদ্বাস্তু মানুষ। তাকেও নারীর শরীরে আশ্রয় পেতে হয়। নিনা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করার মত অনুতপ্ত মন নিয়ে গিয়েছিল কি না এখন এ প্রশ্ন অবান্তর। এও যেন আর এক রকমের হারিয়ে শূন্য হয়ে যাওয়া। এরপর শুধুই ছোটা, দুর্গমতার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে। নিজের কাছ থেকেই যেন পালিয়ে যাবার জন্য। তার জীবনের সবগুলো রাত মিলে একটা মৃত্যু। সেই মৃত্যু ধরে আছে তার দেহ। এই পচনকে দেহ দীর্ঘদিন বয়ে এসেছে, এই পচন সমস্ত রেসারেক্শনের অতীত। এই হারানোর ধ্বস থেকে বাঁচতে শেষবিন্দু শক্তি দিয়ে নিনা সেন্ট সাইমনকে অনুসরণ করে চলে।

সবার পথচলা কিছু সার্থক হয় না সকলেই পৌঁছুবে এমন কথা নেই। যুবক যোদ্ধা ড্যান ব্রুন বলতে চলতে বারবারই যেন পথের ধারে সাইনপোস্টে কোন নাম দেখতে না পেয়ে গ্রামের আগুনে পোড়া একটি ঘরে যখন একটি ঘোড়ার কংকালের কালির ছাপ দেখতে পেলো তখন সে

তার মার্কিন রিভলবারটা দিয়ে নিজের মাথার খুলি ফাটিয়ে দিলো । বুড়ো আইজ্যাক যে কিনা চল্লিশ বছর আগে একবার ধর্ম আর সমাজ থেকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে সবুজ সেমিজ পরা, লাল সেমিজ পরা, লাল সোনালী সবুজ মদের সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে সেমিজ পরা, যেন হাতির দাঁতের তৈরী উরু রেবেকার নরম দেহে আশ্রয় পেয়েছিল সে আজ দলের সাথে এতটা পথ হেঁটে এসে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে কোথায় নেমে গিয়েছে তা কেউ জানে না । সব নদী সাগরে মেশে না । ফেরেন্সের বোগাস্পের ঘটনা মনে পড়ে যাওয়াও এমন এক প্রমাণ । অনেক লোককে আশা দিয়ে বোগাস্প অন্ধকার রাতে এক শহরের গলির কাছে নিয়ে এসেছিলো । কিন্তু কোন পথ বের না করতে পারায় ক্রুদ্ধ হতাশ মানুষেরা তাকে নিজের রক্তে স্নান করিয়েছিল । যে পথ নিজের জানা ছিল না সে পথে তাদের টেনে আনার একমাত্র পরিণতি মৃত্যু । জারোর মনে পড়ে নিকানোর ঘটনা । যে কিনা একাই দেশের শাসনতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করে সবার কাছে হাস্যকরভাবে বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিলো, বন্ধুপ্রীতির বিনিময়ে বন্ধুত্বের উত্তাপ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো ।

ক্লিন্টের বড়োভাই ট্যাভেকর জায়া তার পেটে সন্তান নিয়ে তার মা বেয়নেটের খোঁচায় মারা গেলেও সে বিশ্বাস রাখে অ্যাভলনে পথের ধারে হয়তো ক্রোকাস ফুটতেও পারে । হয়তো পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখা যাবে একটা সবুজ উপত্যকা আইভি লতায় ঘেরা । বাড়িঘর, হলুদ দেয়াল, লাল ছাদ আর তাদের একপাশে সাদা গম্বুজের চার্চ । হয়তো পৌঁছুতে সময় নেবে, তবুও তা অ্যাভলনের সবাই ।

সেন্ট সাইমন সমস্ত দলের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম । তার মুখ দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় ছিল না । কারণ মুখটা ছিল মুখোশে ঢাকা । ফলে চোখের নীচ থেকে চিবুক পর্যন্ত তার মুখে ছিল এক রহস্য মোম মসৃণতা হাজারো চিন্তাতেও যেটা স্থির । মুখোশের নীচে হয়ত একটা দৃঢ় চিবুক নিশ্চয়ই ছিল যা তাকে সমস্ত প্রতিকূলতা এড়িয়ে অবিচল

থাকতে দিয়েছে। লোকটি দলের মধ্যে সবচাইতে কম কথা বলে, [illegible] সবচেয়ে কম হা হুতাশ করে। তাই দলের পেছনে পড়া লোকেরা যখনই ঘোর ভেঙে জেগে ওঠে তখন তাকে কাছে দেখতে পেয়ে তার সংগে দলে ফিরে আসতে পারে। হয়তোবা সে-ই দলের পথপ্রদর্শক। তাই বহু বাধা এড়িয়ে উদ্বাস্তু দলটা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে একটা গভীর কনিয়নের সামনে বহু আগে ব্যবহৃত দড়ির পুলের সামনে থমকে দাঁড়ায় তখন তাকেই সবচেয়ে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। কারণ ওপারেই আছে সেই আশ্রয় যা হয়তো বা অর্বাচীন কোন স্বপ্নদ্রষ্টার ছড়ানো গুজব। মুখোশটা খুলে ফেলে সেন্ট সাইমন দড়ি ধরে যখন চলার প্রস্তুতি নিলো কাছে ছিলো একমাত্র নিনা। স্থির স্থির নিনার চোখে ফুটে উঠলো সেন্ট সাইমনের মুখে নাকের বদলে শুধু দুটো গর্ত। মূলহীন নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়তৃষ্ণার পরিণতি হয়তবা মৃত্যু কিংবা জীবনের সারাংশের বদলে নীরস একটা কাঠামো মাত্র।

উপন্যাস - সেতো জীবনেরই অন্য নাম। জীবনের ঘনসংবদ্ধ রূপের মধ্যে উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে ঔপন্যাসিক জীবনের সাথে, সমাজের সাথে জড়িয়ে আছেন কাজেই সমাজ নিরপেক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের গঠনে কোন পরিবর্তন এলে তার ঢেউ গিয়ে লাগে মননে। সাহিত্য জগৎ ও জীবন বিমুখ হতে পারে না। চাতক পাখীর মত 'ফটিক জল' নয়, বাস্তবতার ঘড়ার জলে তার তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়। তাই সাহিত্যে রাজনীতি সমাজসচেতনতারই অন্য নাম। কাজেই ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতার আলো তার সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহৎ ঔপন্যাসিক তার সৃষ্টির ভেতরে রসরূপের সাথে মিশিয়ে দেন জীবন যাপনের ধরণ, শ্রেণী সংক্রান্ত নানা সমস্যা এবং সমাজের নানা সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। রাজনৈতিক এবং আর্থ সামাজিক দ্বন্দ্বের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামের যে ঘটনাটি সংঘটিত হয় তার ফলে সমাজের বনিয়াদ যেমন তেমনি ব্যক্তির মননেরও বনিয়াদ পরিবর্তিত হয়। এই বক্তব্যই যখন কোন সার্থক শিল্পীর লেখনীতে কায়রূপ ধারণ

করে তখন সেই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত না বলে উপায় নেই। আমরা ভারতবাসীরা ১৯৪৭ সালে যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমাদের সবদিক দিয়ে মুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে পারেনি। আধা সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র আমাদের দেশে আজও রয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শ্লোগানে সাম্যবাদের বৃহৎ প্রচারে আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছি বলে বিশ্বাস রাখছি ততই গ্রামে গঞ্জে একশ্রেণীর স্বত্বাধিকারী মানুষ অন্যশ্রেণীর মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনীতির পালাবদলে অনেক অপরীক্ষিত সত্তা ক্রমশ: তাদের থাবা বাড়িয়ে ধরে নিতে চাইছে অনেক কিছু। অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর আধুনিক শহর জীবন গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে নিয়ে মমতাহীন আশ্রয়হীন এক শূন্যতার দিকে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে। বন না থাকলে, জঙ্গলের আশ্রয় না থাকলে সর্বহারা মানুষ যাবে কোথায়? সব জায়গার মালিকানা নিয়ে কেউ না কেউ বসে আছে। এই ভূমিহীন কৃষকদের কান্না, তাদের সংগ্রাম আর বামপন্থী কিছু বিচ্যুতির বিরুদ্ধ মতের দমকে গড়ে উঠেছিলো এক কমিউনিস্ট আন্দোলন, উত্তরবাংলার নকশালবাড়িতে যার প্রথম সূত্রপাত বলে নাম 'নকশাল' আন্দোলন। সে আন্দোলনে চাষী কমরেডদের পাশে সংগ্রামে নেমেছিলো বহু মেধাবী বুদ্ধিজীবি। তাদের পথ ঠিক না ভুল সে বিচার ভবিষ্যৎ সংগ্রামীদের হাতে কিন্তু একনিষ্ঠতার চরম মূল্য দাবী প্রসঙ্গে তার উত্তরাধিকার আশা এখন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এসব ভাবনা চিন্তার দলিল প্রমিয়াসুমের দুটি নভেলেট মলং মাকনাই কথা আর কোঁদাল। দুটি অংশ এক মলাটের নিচে গ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'এই অরণ্য এই নদী এই দেশ' নামে।

মলং'কে কেউ বলেন নদ আবার কেউ বলেন নদী। উত্তরের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে অথবা বন্যার তাণ্ডবে। পাশেই বড় নদী মাকনাই যাকে দেখবার জন্য মলং উদ্গ্রীব। বনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী আর নদীর পাশে পাশে গড়ে ওঠা গ্রাম, আর মানুষজন, যাদের কোচ,

রাভা কিংবা রাজবংশী সবই বলা যায়। ফলং যেখানে মানসাই'এর খুব কাছাকাছি সেখানে একটা গ্রামের নাম উধুণ্ডি। গত পনেরো বছরে পাকা সড়ক, দোকানপাট, ধানের কল, পুলিশ, হেলথসেন্টার, বেশ্যাপল্লী, তিনটে ইলেকশান সব নিয়ে যে এখন প্রায় শহর। উধুণ্ডির মালিকানা গজেন্দ্র ঢালির। সেই গজেন্দ্র যে নাকি ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছিলো, যাকে দেখে মেয়েরা অস্বস্তি বোধ করতো। সে সময়ে গজেনকে দু একবার অনেক রাতে অন্ধকারে মলং'এর ধারের পুরানো ইটভাটার পরিত্যক্ত গদিঘর থেকে বাড়ন্ত গড়নের মোটামোটা সতীর সাথে বেরোতে দেখা গিয়েছিলো। সেই গজেন যে সহপাঠী অন্য আদর্শে বিশ্বাসী সরিৎকে বাস স্ট্যাণ্ডে ভোটের সময়ে প্রকাশ্যে খুন করেছিলো। সাক্ষী দিয়েছিলেন হেলথ সেন্টারের নার্স আর ডাক্তার। তারা ভাবতেই পারে নি খুনের আসামীর দণ্ড মকুব হয়ে যাবে। রাজনৈতিক পালাবদলে কি অপরাধেরও পালাবদল হয়? অথচ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এরকমই ঘটে, তার ক্ষমতায় বিপ্লবী প্রশাসকেরা এলেও। তাই বছর পাঁচেক পর যে গজেন ঢালি গ্রামে ফিরে এলো তাকে রাজনীতি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়েছে। পুলিশ তাকে কুর্ণিশ করে। কাজেই ডাক্তারকে পালাতে হল। কম্পাউণ্ডার আর নার্স দুজনেই তাকে স্বীকার করে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে চাইলো। অথচ পৃথিবীর ক্ষমতাবানেরা সব কেড়ে নিতে চায়। তাই একদিন গভীর রাতে হয়তবা অসহায়া নার্স মায়ের সম্মতিতেই চন্দামনি নষ্ট হয়ে গেল। শেষ রাতে সে বুঝতে পেরেছিলো যে কেউ তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, খুবলে খুবলে খাচ্ছে। নিজের অস্তিত্ব থেকে অনিচ্ছায় সরে গেলে তাকে উদ্বাস্তু বলে। তাই বয়সে ছোট ফালটুর হাত ধরে চন্দামনি পালালো। কিন্তু তারা জানতো না সেখানে যারা অন্য জায়গা থেকে উৎখাত হয়ে একদিন এসেছিলো সেদিন তাদেরও আবার উৎখাত হবার পালা। আশ্রয় পাওয়া গেল আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে উদ্বাস্তুদের ঝুড়ে আর তাঁবুর

শহরে। সেখানেই চন্দানি কালটুকে কাছে টেনে নিয়েছিল, বলেছিলো - ছোট থেকে কি লাভ, এবার বড় হও, আমাকে ছুঁয়ে বড় হয়ে যাও। বছর দেড়েক পর তাদের উঠে আসতে হলো মান্দাইঘাটে, ব্রীজ তৈরীর জন্য প্রচুর লোকজনের মাঝে। চন্দানি ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরের সামনে বসে গরম চা বানায়, রুটি তরকারি বিক্রী করে। আর কালটু বিড়ি বাঁধে। বড় ছেলে বটু নিজের না হলেও ছটু'র পিতৃত্বের দাবী কালতু প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। একদিন সেখানে লেদু মিঞার আবির্ভাব, উর্ধ্বতন ডাক্তারবাবু যাকে একদিন নিয়ে এসেছিলেন তার কোয়ার্টারে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পৃথিবীর সীমানাটা রাজনৈতিক অধিকারের আওতায় অনেক ছোট তাই কালটুকে মান্দাইঘাটে এসে পড়েন যখন আক্রমণ করলো, চন্দানি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো। লেদু মিঞা অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গরম তেলের কড়াই গায়ে ঢেলে কালটুকে বাঁচালো। তারই পরামর্শে বটু ছটুকে নিয়ে চন্দানি পালিয়ে এলো বনে। জীবনে আবার সব সাজানোর দিন। তার অনেক দিনের প্রতিষ্ঠার সুপ্ত রাজনীতির নিষ্ঠুরতার কোপে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এবারে বনই হতে পারে একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু সেই বন কোথায়? মানুষের লোভে তা যে ক্রমেই ছোট হতে হতে প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বনের নিবিড়তা এখন আর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, ঘন অন্তরাল লজ্জা নিবারণ করতে সমর্থ হয় না। বনের হিংস্রতা ছাপিয়ে মানুষের হিংস্রতা আরও প্রকট। সব বনই এখন কারো না কারো দখলে। লেদু মিঞা নিঃশব্দে বনে আর শহরে যাতায়াত করে। গভীর রাতে বনের বাঘের মতো তার চলাফেরা। অথচ এমন একটি উপলব্ধির সময় এলো যখন প্রাণপণ চেষ্টা করেও লেদু মিঞা আর লেদু মিঞা থাকতে পারলো না "সেই সময়েই কি সেই লেদু মিঞা বলেছিল, অনেক চেষ্টা করেও লেদু মিঞা হওয়া যায় না। মানুষখেকোরা খিদে না পেলে মানুষ মারে না। লেদু মিঞারাও বাধ্য না হলে মানুষ মারে না, মানুষী।

তার চাইতে মধু মধমের, মধরেন যা হয় বল, যারা মানুষ মারে।"
(এই অরণ্য এই নদী এই দেশ, পৃ-৭৬) তাই চার বছর আগে যে মলিন
জোতদারকে সে মেরেছিলো তার স্ত্রীর জমি চাষের অভাবে বেদখল
হয়ে যাবে সম্ভাবনায় সে জমিতে চাষ দেয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে "তো
সেই ভোর রাতে জোতদার বেটিছাওয়া ঠান্ডায় জলে কাশির ধরছে,
কাশির ধরছে। তো ফির আগুন জ্বালায়্যা চা, তেজপাতা আদা জ্বাল দি
দিছে। আগুনের সামনা বসি সেলা হাত তাপাই, পাও সেঁকি, হাত পা
সবই শ্যাক শ্যাক, তো জোতদারের বেটি ছাওয়াও আগুন তাপায় পাশে
বসি। সেলা তার পাত হঠাৎ হাত রাখছং। সেলা কইছং মুই এ সমু,
যেদু সমুর নাম শুনি থাকেন।" (তদেব, পৃ-৮০) একি অনুতাপ? [illegible]
নাকি ভুল পথে দীর্ঘদিন চলার ক্লান্তি? বিশ্বাসের পথ চলার পৃথিবীটা
হারিয়ে সমু ওরুফে নেদু বুঝি বড় ক্লান্ত। দেশত্যাগের ক্লান্তি তার।
সে বিশ্রাম চায়, আশ্রয় চায় "আর সেদিন নেদু মিত্র বলেছিল, আন
মনৎ করি, বরং যদি পৃথিবী ফাটি যায়, এমন ফাটল যে সেইটে গেলে
আর ওঠা না লাগে, পৃথিবীর ঠান্ডায় ঘুম আসি যায়, ঘুম, ঘুম,
ঘুম আর না ভাঙে।" (তদেব, পৃ-৭৪) এই আশ্রয় দিতে পারে পৃথিবী
কিংবা নারী। চন্দানি সেই পৃথিবী হতে চেয়েছিলো "সে সন্ধ্যার ম
লাল কালচে নীলে মিলিয়ে যেতে থাকলে প্রায় এসেছে এমন বর্ষার ঝিঁ ঝিঁ
ঝিঁ কাঁপানো স্নিগ্ধতায় তেমন করে চুল খুলে দিয়ে পৃথিবী হতে
চেয়েছিলো সে? ভেবেছিলো সাহস করে পৃথিবী হবে সে? নেদু ঘুম
যা ভাঙে না তেমন ঘুম এসব বলেছিল। সে পায়ে কাপড় রাখে নি।
সেই পৃথিবীর ফাটল কি মিত্রকে স্নিগ্ধ করেছিল?" (তদেব, পৃ-৭৪)
আশ্রয়ের কাছাকাছি যাবার বাসনায় শহর থেকে আসা লেখাপড়া জম
জানা নেদু মিত্র সেজে থাকা নেদু মিত্র বলেছিল "কাউকে বলে
যেতে ইচ্ছা করে। কথাটা তার মধ্যে আশ্রয় পাক এরকম ইচ্ছা হয়।
একজন কেউ জানুক কোথায় থেমে গেল কে। আর, ডাক্তার ধরা পড়েছে

এতদিনে । আর সে বলেছে সবই ভুল ছিল । অত রক্ত, অত রক্ত । বল, ভুল বললে সে মানুষগুলো ফিরে আসে ?'' (তদেব, ৭৫)
ভাবনাটা শরীরের অস্তিত্বের মতো মনেও প্রোথিত হয়েছিলো চন্দ্রানির ।

রাজনীতির অধিকারী গজেন পুলিশ নিয়ে বন আক্রমন করলে লেদু মিঞাকে গুলি খেয়ে মারা যেতে হলো । অরণ্যের সাথে সাথে বাঘেরও যেমন শেষ আশ্রয় নষ্ট হয়ে যায় এই সমাজে লেদু মিঞারাও তেমনি আশ্রয় হারিয়ে ফেলছে । এরা বিশ্বাস করে চারপাশটা মানুষ সাপদের অর্থাৎ ভোটবাবুদের নিয়ন্ত্রণে । একমাত্র দু একটা ছোটো-খাট বন পৃথিবীর মানুষদের 'শেষ থাকিবার স্থান' । বনের বাঘের হিংস্রতা আর সিংহের শক্তি ঔদার্য নিয়ে যে সব মানুষ ঘর বাঁধে বা বাঁধন ভেঙে বাঁচতে চায় তাদের অবস্থা বুঝি সার্কাসের তাঁবু ছিঁড়ে পালিয়ে আসা 'সিংহী' মতো অসহায় মৃত্যু । কিন্তু এখানেই শেষ নয় । সিংহীর মৃত্যু হলেও তার তিনটে বাচ্চার দুটো বেঁচেছিল যদিও তাদের অনেক প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে হবে । চন্দ্রানি বটুকে চিরকালের মতো জঙ্গলে হারিয়ে ফেললেও ছ বটু আর অনাগত সন্তান পৃথিবীতে সেইরকম উত্তরাধিকার বয়ে আনবে এই দ্যোতনা উপন্যাসের শেষে লেখক শুনিয়েছেন । এখানেই উপন্যাসটি মহত্তর হয়ে উঠতে পেরেছে ।

'সোঁদাল' যে অঞ্চলের কাহিনী নদীর নাম ধরলে সেখানে তিনটি নদী দক্ষিণ পশ্চিমে হাতকাটা, দক্ষিণে হাদলমারি, দক্ষিণ পূর্বে লাউতাযা আর গ্রামের নাম হয়ত আধুরার হাট, দলদলি কিংবা টাইনখারি । কিন্তু আজকাল আর গ্রামগুলো থাকছে না, গ্রামের লাগোয়া বনতো দূরের কথা, বনের লাগোয়া ধানখেত আর পাটখেত শক্ত হয়ে যাচ্ছে । অন্ধকার, আধা অন্ধকার, সবুজ মেশানো কালো অন্ধকার থেকে হলুদ ধূসর সূর্যালোকে, আদিমতা থেকে আধুনিকতায় পৌঁছে যাচ্ছে সব । অথচ অঞ্চলের উত্তর অংশটায় এককালে মহাবন ছিল - ঘন বনস্পতি, হিংস্র জীবজন্তু, ঝরণা, ঘাস ছিল । সেখানে একদল মানুষ ছিলো যাদের অসুর উপজাতি বলে । গায়ের রঙ আধো

অন্ধকার শ্যামল, নাক টিকালো, চোখের মনি বড় আর ধুরা ধরণে ।

একটা ধান এক মরশুমে হাজারটা ধান আনে এই আবিষ্কার মানুষকে আজকের সভ্যতায় পৌঁছে দিয়েছে । ধান উৎপাদনের পদ্ধতিতে যে কোন সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি নির্ধারিত হয় এই সত্য এ অঞ্চলের আর এক অধিবাসী রাভাদের লক্ষ্য করলে বোঝা যায় । তারা বলেন 'নাংকোচা' - আমরাই কোচ । গারো পাহাড়ের এই বীর অধিবাসীরা সমতলের কোচদের আহ্বান করেছিলো ধান চাষ শিখতে । সে সেই থেকে ধানজমি, রাভাবাড়ি আর মেয়ে এক হয়ে গেছে । মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এদের । মায়ের পরিচয়ে পরিচয়, সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার । রাইন্তুক ঠাকুরানীর পুজা উপচার চকোৎ মদ । মৃত্যুর সময় কানে কানে রাভা রমনী বলে দেয় গোত্র পরিচয় টিকাবাইরাই । পুরুষ লাগঁনের ফলা হয়ে রাভাকন্যার শরীরে আশ্রয় পায় আবার তার মৃত্যুতে গৃহহীন হয়ে বনে যেতে বাধ্য হয় । এজন্য রাভা সমাজের পাশে পাশেই থাকে বন ।

অরণ্যের কিছু নিজস্ব নিয়ম আছে যে নিয়মে বনে ফুল ফোটে, বর্ষা হয় আবার গাছে গাছে পাখীর ডাক ও শোনা যায় । অরণ্যের বাসিন্দাদের একটা স্বাধীন সত্তা থাকে, কোনো মালিকানার রক্তচক্ষু তাদের তাড়া করে ফেরে না । সব শুধু নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া । অরণ্যে জীবন আর মৃত্যু কে কাকে কখন করে তা বলা যায় না । যেমন জিন্নি বা তিন্নি । এককালের বিশাল বাথানের পরিবর্তে এখন সামান্য এক দুটো মোষের ছানা সহ নিজে সন্তান নিয়ে গভীর অরণ্যের ধারে তার বাস । একদিন অরণ্যে সন্তান রেখে পাশের পুকুর থেকে যখন শাপলা তুলছিল তখন পতনশীল তার ছেলেকে দুহাত বাড়িয়ে রক্ষা করতে গিয়ে যে মানুষটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল সে হলো মোহান্ত । বুনো বাঘিনীর মত প্রখর গর্জে উঠলে যখন বোঝা গেল প্রকৃত উদ্দেশ্যটা তখনই ফল্গু ধারার মত শুশ্রূষার তরল

ধারা বয়ে গেল অপরিচিত পুরুষটার দিকে ''মোল্লাতের স্মৃতিতে আছে, বড় বড় চোখের সেই কালো মেয়ে, যার পরনে খুব প্রকট খাটো হলুদে শাড়ি যে তার বুকের আধখানা দু-এক মিনিট থেকে মোল্লাতের চোখে পড়ছিল, সেটাকেই যেন মোল্লাতের ঠোঁটের উপরে ধরেছিল, আর উষ্ণ সুস্বাদের তরল জীবন তার মুখ, গলা, বুক, সারা শরীরে ধীরে ধীরে ছড়াচ্ছিল।

এটা অবশ্যই ঠিক নয় যে সেই কালো ছিমছিম তিন্নীর শরীর থেকে তার শরীরে জীবনের ধারা আসছিল। পাশে রাখা বাঁশ চোং থেকে আরও ছোট তেমন বাঁশ চোং-এ ঢেলে ঈষদুষ্ণ মোষের দুধ ঢালছিল তিন্নি অনু মোল্লাতের কিছু ফাঁক করা ঠোঁটের ফাঁকে। খুবই সন্তর্পণে, খুবই ধীরে। গলাত নাশি না যায়।''(তদেব, ১১৪) নিজের আস্তানায় তুলে এনে আবিষ্কৃত হলো মোল্লাতের এক পায়ে শত্রুর গুলি বিঁধে আছে। দূর থেকে কম্পাউন্ডার নিয়ে এসে নিজের সামান্য সম্বল ভেঙে সুস্থতা আনতে হয়। এরপর 'এককুড়ি তিনি চারি' বয়সের দুটি মানুষ কাছাকাছি হলে তাতে দোষের কি আর থাকে। বাগানের মোষ বিক্রী করে তাকে সুখী করার জন্য তিন্নি হাটে সওদা করতে চায়। কিন্তু 'চিরদিন সমান নাহি যায়', আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যার হাতে শক্তি তারই ভোগের অধিকার জন্মায়। তাই দুটি তথাকথিত সভ্য মানুষের সমবেত অত্যাচারের মুহূর্তে একটিকে হত্যা করে অন্যটিকে তাড়িয়ে দিয়ে তিন্নিকে রক্ষা করে মোল্লাত। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে তিন্নি শহরে পালিয়ে যায় আর মোল্লাত যায় পাশের গঞ্জে যেখানে স্মৃতিবিভ্রমে সে 'পাগলা' বলে পরিচিত হয়। সমাজের পরিবর্তনের স্বপ্ন যাদের চোখে তাদের ধারণা বাস্তবায়িত না হলে, রাষ্ট্রব্যবস্থার শোষণ ক্রমাগত: দুর্বলের ওপর নেমে আসতে থাক থাকলে পাগল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মোল্লাত কিংবা যার আসল নাম মোদনাথ তারা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পড়তে একসময় অনুভব করেছিলো রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতার কথা, প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাইতো সুপ্রিয়র মতো বন্ধুকে নিয়ে

শ্রেণীশত্রুকে খতম করার প্রতিজ্ঞা দাঁত চেপে তারা পথে পা দিয়েছিল। একালের বিপ্লবের ছুরিটি ছেড়ে পথে নামা উদ্‌ভ্রান্ত অসহায়তা। চোখে স্বপ্ন নতুন ঘর - শোষণমুক্ত সর্বহারার সুখী সমাজ। কিন্তু সব কি ঠিক হলো? অতি বাম বিচ্যুতি তাদের কি জনগণ থেকে বিচ্যুত করে ফেললো না? আবার কৈচেন্দুর মতো যারা উচকিয়ারা নামের একটি ব্লকের সভাপতি, যারা অন্যদেশ থেকে পালিয়ে আসা লোকদের এদেশে বসিয়ে র‍্যাশন কার্ড করে দিয়ে ভোট কেনেন, জি.আর.-এর সাহায্য দেন, দলতন্ত্র আর ব্যক্তিস্বার্থকে একাকার করে দিয়ে জঙ্গলের চোরাই কাঠের ব্যবসা করেন মুখে সমাজ পরিবর্তনের কথা বললেও দক্ষিণপন্থীদের সাথে তাদের পার্থক্যটাই বা কোথায়? প্রশাসন আর খোকনেন্দু'র মত পোষা গুণ্ডা দিয়ে তাদের অধিকার বজায় রাখতে হয়।

অরণ্যের স্বাধীনতা হারিয়ে মুখে রক্ত মেখে শহরে তিন্নি খাঁচাকলে আটকে পড়ে। মোল্লাত বা মোদনাথ তাকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে অরণ্যে নিয়ে যায়। অরণ্যের শুদ্ধতা, সরলতা, সাম্য একমাত্র আমাদের পুনর্বাসন সহজ দিতে পারে। কিন্তু খোকনেন্দুর সহজ হাতে নতুন টেলিস্কোপিক রাইফেল এনে সে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে বহুদূরের অরণ্য থেকে বাইরে আসা মোল্লাতের ওপর - ''কিছু টের পাওয়ার আগেই সে কয়েক গজ ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল। সে হঠাৎ যেন তিন্নিকে দেখতেই শেষবারের মতো মাটি থেকে ঘাস থেকে মাথাটা তুলতে গেল। দুনাক দিয়ে, হা হয়ে যাওয়া মুখের দুকষ দিয়ে তাজা অজস্র রক্ত গড়াচ্ছে। সে কি শেষবারের মতো বাতাস গিলবে? অথবা কিছু বলে যেতে চায়? তখন কি ভাষার কিছু ঠিক থাকে? সারা-জীবনের সব কিছু একসঙ্গে জমাট বাঁধে। মনে হতে পারে, মুখ খোলা বন্ধ করা দেখে সে তিন্নিকে কিছু বলছে না। সে তখন বাংলায় মহিষমোতি কিংবা ইংরেজীতে মাই ওয়াইফ বলল বা।''(তদেব, ১৬৪)

ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা মানুষগুলো বারবার যোদ্ধাদের স্বপ্ন চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। তবুও যোদ্ধারা জন্মায়, অরণ্যের অধিকার খুঁজে ফেরে এবং যুদ্ধ চিরকালের মত বন্ধ করার আগে তাদের প্রেরণা - তাদের স্বপ্ন - তাদের প্রিয়া স্বাধীন মহিমময়ীর নাম উচ্চারণ করে যেতে চায়।

'অরণ্যেরোদন' গল্পটি শারদীয়া 'দাবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যাকে নিয়ে মূল গল্প তার নাম আরতিশিখা। নামেই যেন চরিত্রটির তাৎপর্য ফুটে ওঠে। জীবনদেবতার যজ্ঞে আরতির প্রদীপ শিখার মত প্রজ্জ্বলিত এই নারীটি রাজনীতির চোরাবালিতে পঙ্কিলতায় নিজের অবস্থান হারিয়ে ফেলেছিল। সারা জীবনের কঠিন লড়াই তাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়ে আবার পিছনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিলো। বাবা ছিলেন দূর চট্টগ্রামের এক গ্রামের টোলের পণ্ডিত। তার কাছেই সে শুনেছিলো সব মানবতাবাদের পটভূমি কলকাতার কথা, দেশপ্রেমের কথা, নিজেদের সংস্কৃতির কথা। বিয়ের পর গোয়েন্দা দপ্তরে কর্মরত স্বামীর মতের বিরুদ্ধেও সে দেশপ্রেমের শিখাটিকে মনের নিভৃতে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলো। কিন্তু আকাশে যখন কালো মেঘ তখন জীবনে নিশ্চিন্ত সব বিশ্বাস চির আশ্রয় পেতে পারে না। তাই ভৈরবের ব্রীজের সামনে ট্রেনটা থেমে গেলো একদিন। হিন্দু মুসলমানের এতদিনের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিলো রাজনীতির হীন চক্রান্তে। সেই চক্রান্তের হিংস্র বলি হলো ভৈরবের সামনে দাঁড়ানো ট্রেনটির অজস্র মানুষের সাথে আরতির স্বামী আর সে নিজে। আশ্রয় পাওয়া গেলো পাশের গ্রামে কাদার গ্রাহামের পাঁজায়। আশ্রয় - শান্তি - নিশ্চয়তা। কিন্তু যেদিন 'বিদেশী' সংবাদদাতাদের কাদার জামানের কোন দার্গা হয়নি - কোন মেয়ে অত্যাচারিতা হয় নি সেদিন আরতিশিখার কাছে অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে গিয়েছিলো ''...একটা জ্বালা বোধ করছিলো সে। জলে সে একখানা হাত ডুবিয়ে নিলো। আরও স্থির হতে হবে তাকে।

কারণ কথাটা হচ্ছে রাজনীতি। ফাদার গ্রাহামের স্বদেশের সাংবাদিকেরা যা শুনতে চেয়েছিলো সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী যা তাদের শোনা উচিত তাই তারা শুনেছে।" (অরণ্যে রোদন, পৃ.৫৪) সামনে নদী, ওপারে ভারত, রামায়ন মহাভারতের দেশ, মুক্ত বাতাস বয় সেখানে। সহকারী ফাদারের কাছে নারীত্বের মূল্যে তাকে এপারে পালিয়ে আসতে হলো। উত্তরের ঘটনার চাইতে এ ঘটনা কম বেদনাদায়ক নয়। মুক্তির কিছু মূল্য সবাইকে অবশ্যই দিতে হয়। আরতিও দিয়েছে। এপারে এসে বহুদিন পথ ঘুরে আশ্রয় জুটলো উদ্বাস্তু কলোনিতে। রোদবৃষ্টির দুঃসহ ক্লেশ, পূতিগন্ধ মালিন্য আর মানসিক গ্লানি নিয়ে নবজীবনের খোঁজে একদল মানুষ। অথচ তারা কারো রাজ্যপাট কেড়ে নিতে যায় নি। সেখানেই পরিচয় সেই ছেলেটির সাথে যে কিনা বয়সে আরতির চাইতে কিছু ছোট, যে তার নারীত্বকে সম্মান করতো। তার কাছেই আরতি প্রথম শুনলো নতুন এক সমাজ তৈরীর আয়োজন চলছে সারা ভারত জুড়ে। যোগ দিতে গিয়ে ফ্যাক্টরীর চাকরিটি গেলো। রাজনীতির চোরাবালি বারবার নীচে টেনে নিয়ে যায়। কত কষ্টে পাওয়া আশ্রয় আবার ছাড়তে হলো তাকে। আর সেই মানুষ? যে তাকে পথে নামালো? সে বুঝি তখন অন্যখানে, অন্য কাউকে নামাতে আবার সচেষ্ট।

এরপরের দৃশ্য জমিদার বাগানের আম গাছের নীচে বসে থাকা এক প্রৌঢ়া পাগলী, যার সমস্ত গায়ে দগদগে ঘা। পাশেই থাকে এক নেড়ী কুকুরী যার হতকুচ্ছিত অবস্থাও যাকে অবাঞ্ছিত গর্ভবতী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে না। আগামী সম্ভাবনাকে পৃথিবী দেখাবার আগেই চোখের বিষ মাখানো হানুয়া রাখতে গিয়ে এই বিদায় দুঃখজনক হলেও মেনে নিতেই হবে। আরতি এক দুপুরে কানা জেলেকে অনুভব করে নিজের শরীরে। জঠরে সেই কান্না গাথা কোটার ভরীতে যেন দুলে ওঠে। রাজনীতির চোরাজাল তাকে আরতিশিখা থেকে ঘৃণ্য

শাখালীতে রূপান্তরিত করেছে হয়তো শেষ পরিণতি হবে নেড়ীর মতো । তবুও মানুষের বাঁচার আকুতি শাখালীর কান্নায় বৃষ্টি হয়ে নামে । যদিওবা সে কান্না হয়ত অরণ্যেরোদন ।

'সাদা মাকড়সা' গল্পেও একই উদ্বাস্তু সত্তার হাহাকার । পিতৃভূমি থেকে উৎখাত মানুষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপনে বারবার স্বপ্ন দেখে সেখানে ফিরে যাবার, শান্তির স্বর্গে অন্তর তৃপ্ত করবার । অথচ যখন সেখানে কোনদিনবা পৌঁছানো গেল দেখা গেল সেথা নয়, সেথা নয়, অন্য কোনোখানে । এটাইতো জীবনের ট্র্যাজিডি । কিন্তু মানুষের খোঁজা সেসব শেষ হয় না । তার চলার ধারা এক খাত থেকে অন্যখাতে বয়ে যায় । এভাবেই বয়ে চলে আধুনিক মানুষের নিয়তি ।

একটু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে অমিয়ভূষণের অধিকাংশ লেখাতেই আধুনিক মানব সত্তার এই উন্মূলিত ভেতরে একই রকমের অনুবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন । এ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন : " Perhaps every significant artist has only one theme, on which he performs endless variations. All Dostoevsky's novels, Proust said, could be called ctime and Punishment, all Flaubert's L' Education sentimentale, All kundera's novels could be called life is elsewhere . ১৪

এই কথারই প্রতিধ্বনি যেন অন্য আর একটি উক্তির ভেতর :

" Most Novelists tell one fable again and again- Some more obviously than others. Their Fable is not al all the story of the Novelist's Life; indeed, it may not even be the record of his personality. His acquaintances may not recognise it as in any way

connected to the man. It is the story of an importan. possibly unresolved, portion of the writer's Psyclic life projected into fiction. If the writer is in touch life projected into fiction. If the writer is in touch with himself, this fable will be extremely close to the Psychic lives of most of us ". ১৫

কখনো মানুষ দুর্ভিক্ষ বা যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতে সমাজ সংসার থেকে বিচ্যুত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ হারিয়ে, গৃহ হারিয়ে, শারীরিক ও মানসিক এই দুই দিক থেকে উদ্বাস্তু বা নির্বাসিত হয়েছে। কখনো শক্তিশালীর অধিকারমত্ততায় মানুষ তার নিজস্ব ভূখণ্ড অথবা নিজের নারীকে হারিয়েছে। কখনো দেশবিভাগের মতো ঐতিহাসিক রাজনৈতিক অপসিদ্ধান্তের ফলে অজস্র মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন করে আশ্রয় এবং নিজের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল নিজস্ব ভূখণ্ড খুঁজে বেরিয়েছে। অমিয়ভূষণ এইভাবে নানাভাবে মানুষের উদ্বাস্তু হওয়াকে রূপায়িত করেছেন। ঐর এই দীর্ঘ এর পৌনঃপুনিকতার ফলে আমাদের এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় যে উদ্বাস্তু হওয়ার সমস্যাটি তাঁর রচনায় ঘটনার স্তর থেকে প্রতীকী স্তরে উত্তীর্ণ [হয়েছে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন নির্বাসিত হওয়া — উদ্বা[illegible]] হওয়াই আধুনিক মানুষের নিয়তি। গৃহহীন - দেশহীন - সমাজহীন এবং চিরন্তন মূল্যবোধ বর্জিত হওয়াই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আধুনিক মানুষের অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য। সেইজন্য একজন ফরাসী কবি আধুনিক মানুষের নাম দিয়েছেন "Jean Sans Terre" অর্থাৎ John Landless। সেই জন ল্যান্ডলেসের প্রতীকী তাৎপর্য নিয়ে কথাচিত্র বারেবারে অমিয়ভূষণের কথা - সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছে।

॥ তথ্যসূত্র ॥

১. সত্যেন্দ্রনাথ রায় - বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, ১৩৯৪, পৃ. ১৮০ ।

২. তদেব - পৃ. ১৩৫ ।

৩. অশ্রুকুমার সিকদার - শতাব্দীখণ্ড পুনর্মূল্যায়ণ, প্রতিক্ষণ, বর্ষ ৫, সংখ্যা - ২, পৃ. ৫২ ।

৪. অশ্রুকুমার সিকদার - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, ১৯৮০, পৃ. ২৮০ ।

৫. গৌরী দেবী - শতাব্দীখণ্ড, আধুনিক সাহিত্য, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ।

৬. জীবনানন্দ দাশ - জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৩৫ ।

৭. উদয়কুমার চক্রবর্তী - অমিয়ভূষণের নতুন পদক্ষেপ, হীনযান, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২৮ ।

৮. তরুণ মুখোপাধ্যায় - মহিষকুড়ার উপকথা : অবসানের গান, পত্রপুট, শরৎ হেমন্ত ১৩৯৪, পৃ. ১১ ।

৯. B.M.Das - Ethnic Affinities ofthe Rabha (Gauhati University) 1060, P-117.

১০. L.A. Waddell - The Tribes of Brahmaputra Valley, 1975, P-48.

১১. S.K.Chatterjee - Kirata- Jana- Kirti, Second Edition, 1974, P-III .

১২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের পুত্তলিকা, ১৩৮২, পৃ. ৪৭২ ।

১৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - সাহিত্যে ছোটগল্প, ১৩৮৪, পৃ.৩৩১ ।

১৪. Gabriel Josipovici - Literature and criticism, TLS, June 24-30,1988,P-695.

১৫. John Jacob Clayton- Saul Bellow's'In Defence of Man ' Chapter- XII .